ইমাম হাসানুল বান্না
ও
সমকালীন মিশর

মূলঃ খলিল আহমদ হামেদী
অনুবাদঃ গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

ইমাম হাসানুল বান্না
ও
সমকালীন মিশর

খলিল আহ্‌মদ হামেদী

অনুবাদ

গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

আল্-ফালাহ্ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।

(প্রফেসর'স বুক কর্ণারের একটি প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)

১৯১, ওয়্যারলেস রেল গেইট, বড় মগবাজার

ঢাকা-১২১৭। ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫

www.pathagar.com

পরিবেশনায়

প্রফেসর'স বুক কর্ণার
১৯১, ওয়্যারলেস রেলগেইট
বড় মগবাজার, ঢাকা-১২১৭
ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫।

প্রাপ্তিস্থান

প্রীতি প্রকাশন, তাসনিয়া বই বিতান
আধুনিক প্রকাশনী, প্রকাশনা বিভাগ
- মগবাজার।

আল-হেরা, জামেয়া, খন্দকার, রশিদ বুক
- বাংলাবাজার।

ইসলামী বই ঘর - ফেনী। স্টুডেন্ট,
প্রফেসর'স বুক ডিপো- নোয়াখালী।

আল-আমীন লাইব্রেরী- সিলেট ও সাতক্ষীরা।

একাডেমী, রেনেসাঁ বুক,
বায়জিদ লাইব্রেরী- চট্টগ্রাম।

ইখওয়ান, আল হামরা লাইব্রেরী - বগুড়া।

ইসলামিয়া লাইব্রেরী - বরিশাল।

আল ফারুক লাইব্রেরী - নওগাঁ।

এ ছাড়াও দেশের সকল সম্ভ্রান্ত পুস্তকালয়ে পাওয়া যাবে।
আজই আপনার কপি সংগ্রহ করুন।

ভি.পি. এল যোগে বই প্রেরণ করা হয়।

ইমাম হাসানুল বান্না ও সমকালীন মিশর

লেখক

খলিল আহ্‌মদ হামেদী

প্রকাশকাল

মে - ১৯৯৮ইং

প্রকাশক

এ. এম. আমিনুল ইসলাম
পরিচালক
আল্-ফালাহ্ পাবলিকেশন্স, ঢাকা

গ্রন্থস্বত্ব

@ লেখক

প্রচ্ছদ

প্রফেসর'স ডিজাইন সেন্টার

বর্ণবিন্যাস

একতা কম্পিউটার

মুদ্রণ ঃ

এস. খান প্রিন্টার্স

মূল্য ঃ ৪০.০০ টাকা মাত্র

IMAM HASANUL BANNA O SOMOKALIN MESHOR BY KHALIL AHMAD HAMIDI
PUBLISHED BY AL-FALAH PUBLICATIONS, DHAKA. PRICE TK. 40.00 ONLY

www.pathagar.com

উৎসর্গ

সেই সকল মর্দে মুজাহিদ
যাঁরা আল্লাহর জমীনে তাঁর দ্বীন প্রতিষ্ঠায়
ঢেলে দিতে প্রস্তুত বুকের তপ্ত লাল রক্ত।

www.pathagar.com

ইমাম হাসানুল বান্না ও সমকালীন মিশর

অনুবাদকের আরয

আল্‌হামদুলিল্লাহ। শহীদ হাসানুল বান্না ও সমকালীন মিশর প্রকাশিত হলো। বিংশ শতাব্দীর মুসলিম জাহানে দুটি আন্দোলন গড়ে উঠে। একটি আন্দোলনের জন্ম হয় মিশরের ইসমাঈলিয়া শহরে ইমাম হাসানুল বান্নার হাতে ১৯২৮ সালে। অপর এক আন্দোলনের জন্ম হয় অবিভক্ত ভারতে মওলানা সাইয়্যেদ আবুল আ'লা মওদুদীর হাতে ১৯৪১ সালে। উভয় আন্দোলনের মূল সূর ছিল এক। সৈয়দ জামালুদ্দীন আফগানী Back to the Quran নামে উনবিংশ শতাব্দীতে যে জাগরণ সৃষ্টি করেছিলেন পরবর্তীকালে গড়ে উঠা এ দুটি আন্দোলনকে তারই প্রতিধ্বনি বলা চলে। এক কথায় এ'দুটি আন্দোলনকে মুসলমানদের হারানো গৌরব পুনরুদ্ধারের আন্দোলন বলা চলে। উভয় আন্দোলনের সার কথা হলো রাষ্ট্রীয় জীবনে ইসলামের পুনঃপ্রতিষ্ঠা। খিলাফাতে রাশেদার পতনের পর থেকে ইসলাম রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে নির্বাসিত হল। উমাইয়া আর আব্বাসীয় যুগে শাসক গোষ্ঠী খলীফা নাম ধারণ করলেও প্রকৃত পক্ষে তা খিলাফত শাসন ব্যবস্থা ছিল না। রাষ্ট্রীয় জীবন থেকে নির্বাসিত ইসলাম নিছক কতিপয় আচার অনুষ্ঠানের নাম হয়ে দাঁড়ায়। ইসলাম যে কিছু আচার অনুষ্ঠানের নাম নয়, বরং একটা পূর্নাঙ্গ জীবন বিধান, সে ধারণাও লোপ পায় মানুষের মন থেকে । বিংশ শতাব্দীর দু'জন মনীষীই গড়ে তোলেন দুটা আন্দোলন।

শহীদ হাসানুল বান্নার সংগ্রাম, সাধনা এবং তাঁর জীবনী আর সমকালীন মিশর সম্পর্কে জানার জন্য তেমন কোন বই বাজারে নেই। মরহুম মওলানা খলীল হামেদী ইমাম হাসানুল বান্নার ডাইরী উর্দূ অনুবাদ করেন এবং ১৯৭৪ সালে ডাইরীর প্রথম খন্ডের দীর্ঘ ভূমিকা লিখেন। এতে ইমাম হাসানুল বান্না ও সমকালীন মিশর সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পরিসরে অনেকটা বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। অবশ্য এ বিষয়ে স্বতন্ত্র বই লিখার ইচ্ছা ছিল তাঁর। কিন্তু তাঁর সে ইচ্ছা পূর্ণ হওয়ার আগেই এক সড়ক দুর্ঘটনায় তিনি ইন্‌তিকাল করেন কয়েক বৎসর আগে। বর্তমান গ্রন্থ মরহুম খলীল হামেদীর দীর্ঘ ভূমিকার বাংলা অনুবাদ। এতে

www.pathagar.com

তিনি কেবল হাসানুল বান্নার জীবনীই আলোচনা করেননি, বরং সমকালীন মিশর সম্পর্কেও বিপুল তথ্য পরিবেশন করেন। মুসলিম জাহানের যে কয়টা দেশে পাশ্চাত্য সভ্যতার অন্ধ অনুকরণ একটা সামাজিক ব্যাধি হিসাবে দেখা দিয়েছিল, মিশর ছিল সেসব দেশের মধ্যে সবচেয়ে অগ্রসর। এরপর ছিল তুরস্ক এবং ইরানের স্থান। ইরান উদ্ধার পেয়েছে। তুরস্কে উদ্ধারের আন্দোলন চলছে। মিশরে উদ্ধারের আন্দোলন দিন দিন তীব্র থেকে তীব্রতর হচ্ছে। মিশরে ইখওয়ানের নেতা-কর্মীরা ইসলাম প্রতিষ্ঠার জন্য যেভাবে জীবন উৎসর্গ করে যাচ্ছেন, তা কেবল সাহাবায়ে কিরামের ইতিহাসই স্মরণ করিয়ে দেয়। হাসানুল বান্না আর সাইয়্যেদ কুতুবসহ অসংখ্য ইখওয়ান নেতা-কর্মীর রক্ত বৃথা যাবে না। তাঁদেরকে যারা ফাঁসির মঞ্চে দাঁড় করিয়েছিল, তারা ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে নিক্ষিপ্ত হয়েছে আর শহীদরা লক্ষ লক্ষ মানুষের মাঝে বেঁচে আছেন এবং অনাগতকাল ধরে প্রেরণার উৎস হয়ে বেঁচে থাকবেন।

আশা করি শহীদ হাসানুল বান্নার জীবনী পাঠে পাঠক মহল অনেক তথ্য লাভ করবেন এবং শাহাদাতের প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হবেন। একই সঙ্গে তাঁরা সমকালীন মিশর সম্পর্কেও অনেক তথ্য পাবেন। মিশরের জনগণ ফেরাউনের উত্তরসুরীদের হাত থেকে রেহাই পাবে এবং সেখানে ইসলাম বাস্তব জীবনে প্রতিষ্ঠা লাভ করবে। এখন এটা কেবল সময়ের ব্যাপার।

প্রকাশক এ, এম, আমিনুল ইসলাম বারবার তাগাদা না করলে এরই অনুবাদ করা সম্ভব হতো না। এজন্য তাকে ধন্যবাদ।

শহীদ হাসানুল বান্নার রূহের মাগফিরাত কামনা করছি। আল্লাহ তাঁর আত্মাকে চির শান্তিতে রাখুন এবং জান্নাতের সুউচ্চ স্থানে তাঁকে স্থান দান করুন।

- গোলাম সোবহান সিদ্দিকী

www.pathagar.com

প্রকাশকের কথা

বিংশ শতাব্দীর অন্যতম মর্দে মুজাহিদ ফেরাউনের দেশে ইসলামী আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাসানুল বান্নার সংক্ষিপ্ত জীবনী প্রকাশ করতে পেরে আমরা আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করছি। মূল লেখক মওলানা খলীল হামেদী শহীদ হাসানুল বান্নার জীবনী ছাড়াও সমকালীন মিশর সম্পর্কে অনেক তথ্য পরিবেশন করেছেন। এ ক্ষুদ্র পুস্তিকায় বিগত শতক থেকে মিশরে কিভাবে বিকৃতি শুরু হয়েছে এবং কোন পরিস্থিতিতে ইখওয়ানুল মুসলিমুনের জন্ম হয়েছে বিজ্ঞ ও অনুসন্ধানী পাঠক এতে বিপুল তথ্য লাভ করবেন। ত্যাগ আর কুরবানীর ক্ষেত্রে মিশরের মাটিতে ইখওয়ার যে দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে , বর্তমান বিশ্বে তার নজীর খুঁজে পাওয়া কঠিন। ইখওয়ানের বানী লক্ষ লক্ষ যুব মানসে বিপুল উৎসাহ উদ্দীপনার সঞ্চয় করেছে। এবং একটা জীবন ব্যবস্থা হিসাবে ইসলামকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য নিজেদের মূল্যবান জীবন উৎসর্গ করতে প্রস্তুত। সত্য আর মিথ্যা যেকোন মতবাদ প্রতিষ্ঠার জন্য রক্তের প্রয়োজন। ইখওয়ানের নেতা কর্মীদের আত্মত্যাগ বৃথা যাবে না, অচিরেই মিশরের মাটিতে ইসলাম প্রতিষ্ঠা লাভ করবে একথা আগামী দিনের সুর্যোদয়ের মতই সত্য।

পাঠক মহল এ বই পাঠে শাহাদাতী প্রেরণায় উদ্দীপ্ত হলে আমাদের এ প্রয়াস স্বার্থক হবে। লেখক এবং অনুবাদককে আল্লাহ নেক প্রতিদান দিন - আমীন।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম

ইমাম হাসানুল বান্না ও সমকালীন মিশর

হাসানুল বান্নার যুগে মিশরের চিত্র

বিংশ শতাব্দীর প্রথমদিকে মিশরে হাসানুল বান্নার জন্ম। শতাব্দীর সিকি ভাগে তিনি মিশর দেশে এমন এক মহান ইসলামী আন্দোলন গড়ে তোলেন, ইখওয়ানুল মুসলিমুন হিসাবে যা পরিচিতি লাভ করেছে। যেমনি পাকিস্তানের ইসলামী আন্দোলন জামায়াতে ইসলামীকে উহার প্রতিষ্ঠাতা মওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদূদী থেকে পৃথক করা যায় না, তেমনি ইখওয়ানুল মুসলিমনকেও উহার প্রতিষ্ঠাতা ইমাম হাসানুল বান্না থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। একটা অপরটার সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িত। হাসানুল বান্নার অনন্য ব্যক্তিত্ব এ আন্দোলন এমনভাবে গড়ে তোলেন, যার ফলে কেবল মিশরেই নয়, বরং গোটা মুসলিম জাহানে ইসলামের প্রাণচাঞ্চল্য সৃষ্টি করে ফেলে। যে পরিবেশে তিনি এ আন্দোলন গড়ে তোলেন, সে পরিবেশ সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ না করে এ মহান ব্যক্তিত্ব এবং তার আসল কাজ হৃদয়ঙ্গম করা সম্ভব নয়। এ কারণে হাসানুল বান্নার আবির্ভাবকালে মিশরের রাজনীতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক পরিস্থিতি আলোচনা করা অপরিহার্য। আমাদেরকে জানতে হবে, কোন স্থানীয় এবং আন্তর্জাতিক কার্যকারণের সঙ্গে তাঁকে সংঘাতে লিপ্ত হতে হয়েছে। হাসানুল বান্নার জীবন কথা আলোচনা করার পূর্বে যে পরিস্থিতি তাঁকে জন্ম দিয়েছে, পাঠক মহলের সম্মুখে তা উপস্থাপন করা হচ্ছে।

মিশর এবং আরব জাহানের আধুনিক ইতিহাস সম্পর্কে আমি যতটা অধ্যয়ন করেছি, তার আলোকে বলা যায় যে, উনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে মিশরে যেসব বড় বড় সমস্যা নিয়ে মাথা ঘামানো হতো, মিশরীয় জাতীয়তা, ইসলামী খিলাফাত, আরব জাতীয়তা এবং প্রাচীন ও আধুনিকের সংঘাত ছিল সেসবের মধ্যে প্রধান। আমরা সেসব প্রধান প্রধান সমস্যা এমন ধারায় পর্যালোচনা করার চেষ্টা করবো, যাতে সে সময়ে মিশরের সভ্যতা-সংস্কৃতি, রাজনৈতিক চিন্তাধারার পূর্ণ চিত্র উদ্ভাসিত হয়।

www.pathagar.com

আযাদী আন্দোলনে দুটি ধারা

১৮৮৩ সালে আ'রাবী পাশার ব্যর্থ অভ্যুত্থান মিশরে ইংরেজদের কর্তৃত্বের পয়গাম বয়ে আনে। এ ব্যর্থতা মিশরের জন্য কেবল রাজনৈতিক দুঃখ বহন করে আনেনি, বরং তা গোটা মিশর জাতির মধ্যে হতাশা এবং ভয়-ভীতি সৃষ্টি করে। আর এর পরিণতিতে মিশর চিন্তা-চেতনা আর নৈতিক দিক থেকে পতন আর নীচতায় নেমে যায়। আ'রাবী পাশার ব্যর্থতা দেখে মানুষ রাজনৈতিক এবং সংস্কার-সংশোধনের নাম শ্রবণ করে আঁতকে উঠতো। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক পর্যন্ত এ পরিস্থিতি বিরাজ করে। অবশেষে একদল মিশরীয় নওজোয়ান নীরবতা ভেদ করে ইংরেজ উপনিবেশকের নিকট থেকে আযাদী দাবী করে, বুলন্দ করে জাতীয় জাগরণের আওয়াজ। এই নওজোয়ান দলের আবির্ভাব ঘটে দু'টি গ্রুপে। একটা গ্রুপ নিজেদের চেষ্টা-সাধনাকে সম্পৃক্ত করে দ্বীনী জযবা আর ইসলামী ঐতিহ্যের সঙ্গে। আর অপর গ্রুপ অবলম্বন করে একটা নতুন ধারা, তারা মিশরীয় জাতীয়তাকে পরিণত করে নিজেদের আন্দোলনের শ্লোগানে। দ্বীনের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন বা ওসমানী তুর্কীদের সঙ্গে যোগাযোগের কথা যারা বলতো, এরা তাদের বিরোধিতা শুরু করে দেয়।

প্রথম গ্রুপ ঃ ইসলাম ও দেশপ্রেমিক

প্রথম গ্রুপের প্রতিনিধিত্ব করছিল আল-হিযবুল ওয়াতামী তথা জাতীয়তাবাদী দল। এ দলের নেতৃত্ব করছিলেন অনলবর্ষী বক্তা এবং তাজা প্রাণ নওজোয়ান মুস্তফা কামেল। আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, এ দলটি ইসলামী ঐতিহ্যের সূত্র ধরে জাতির মধে... মের আগুন প্রজ্জ্বলিত করে তুলছিল। এদের মতে ধর্ম আর দেশপ্রেম ... াধী কিছু ছিল না। মুস্তফা কামেল বলতেন- দ্বীন ও স্বদেশ দু'জমজ ... একজনকে অন্যজন থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। এরা এমন ভ... থা বলতো, যেমন কোন প্রেমিক বলে প্রেমিকার কথা। মি... য়াতী ও মুহররম কবিতা আর সাহিত্যের ভাষায় এ ভ... ফরীদ বেজদী আফেন্দীর মতো পন্ডিত গবেষক ... মতো বিদ্বান ও সাহিত্যিক ছিলেন এ দলের ... এবং মিশরের খেদিভ এ আন্দোলন সম্পর্কে ... বজদী এবং আব্দুল আজীজ জাবিশ গায়াতীর ... অপরাধে উভয়কে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা

www.pathagar.com

অপর দল ঃ ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী

অন্য দল ছিল ইসলামী আদর্শের ভিত্তিতে জীবনধারা গড়ে তোলার বিরোধী। এরা ছিল মিশরীয় জাতীয়তার ধ্বজাধারী। অবশ্য এ জাতীয়তা বলতে তারা বুঝতো যে, মিশর অন্যান্য মুসলিম দেশের মাথা ব্যথার কারণ হবে না, বরং মিশরকে কেবল নিজের স্বার্থ রক্ষা করতে হবে। মিশরীয় জাতীয়তার ধারণা পরিপক্ক করার নিমিত্ত তারা মিশরের প্রাচীন ইতিহাস খুঁজে বের করছিল এবং ফেরাউনের যুগের সঙ্গে নিজেদের ইতিহাসের যোগসূত্র স্থাপন করছিল। তাদের মতে, যাতে মিশরের কল্যাণ হয়, তাই প্রিয়, অ-মিশরীয়দের জন্য তা যতই ক্ষতিকর হোক না কেন। মিশরী জাতীয়তার ডাকে এরা একদল ছিল, কিন্তু তাদের চিন্তাধারা ছিল দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগের প্রতিনিধিত্ব করছিল আল-মুকাত্তাম সাময়িকী। এটা কারো অজানা নয় যে, আল-মুকাত্তাম ইংরেজ ঔপনিবেশিকতার সমর্থক এবং ইংরেজ গভর্নর লর্ড ক্রোমার এর নিকট থেকে লাভ করতো পথ-নির্দেশনা। ইংরেজরা মিশরী জাতীয়তার দর্শনকে চাঙ্গা করে তুলছিল। কারণ, ইংরেজরা চাইতো, মিশর মুসলিম জাহান থেকে বিচ্ছিন্ন থাকুক। মিশরী জাতির মন-মগজে তারা এ ধারণা বদ্ধমূল করার চেষ্টা করছিল যে, অন্য মুসলিম জাতি-তারা তুর্কী, ইরানী বা ভারতীয় যেই হোক না কেন, তাদের কথা বাদ দিয়ে মিশরকে কেবল নিজেদের কথা ভাবতে হবে। এভাবে ইংরেজরা একদিকে আরবকে তুর্কীদের থেকে বিচ্ছিন্ন করতে চাইছিল, অন্যদিকে আরবদেরকে করে তুলছিল আরব বিমুখ।

আল্-মুকাত্তাম সাময়িকী ইংরেজ তোষণে এতটা অগ্রসর ছিল যে, তা স্পষ্ট লিখছিল-

"ইংরেজরা মিশরে অবস্থানের কষ্ট স্বীকার করছে এ জন্য যে, যাতে তারা মিশরবাসীদেরকে যুলুমের নিগড় থেকে মুক্তি দিতে পারে। তারা চায় মিশরীয়দেরকে সুবিচার আর ন্যায়নীতিতে কানায় কানায় ভরে তুলতে। ইংরেজরা চায় মিশরকে অভাব আর দারিদ্র্যের ছোবল থেকে মুক্ত করতে। মিশরে অর্থনৈতিক ভারসাম্যপূর্ণ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব ইংরেজরা গ্রহণ করেছে।"

এ দলের অপর একটা মুখপাত্র 'আল্-মুক্তাতাফ' এ বুলি আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে যায়। মিশরী নওজোয়ানদের একটা উল্লেখযোগ্য শ্রেণী এ দ্বা প্রভাবিত হয়। এরা লর্ড ক্রোমার-এর গান গাইতে শুরু করে। একথা ব

www.pathagar.com

আমাদের দ্বিধা নেই যে, শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর মতো আলেমে দ্বীনও লর্ড ক্রোমার-এর সমর্থকদের দলভুক্ত হয়ে যান। আল-মুকাত্তাম আর আলমুফ্‌তাতাফ-এর চিন্তাধারার বিরোধিতাকারীকে 'তুর্কী ঘেঁষা' বলে আখ্যায়িত করা হতো। কিন্তু একথাও প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না যে, যারা আল-মুকাত্তাম আর আল-মুক্‌তাতাফ-এর সমর্থক ছিল, তারা নিজেদের আকাংখা চরিতার্থ করার জন্য 'আলদোবারা প্যালেস'-এর পৃষ্ঠপোষকতার আকাংখী ছিল। শেষ পর্যন্ত এ স্বার্থপর মহলটি 'আল-হিযবুল ওয়াতানীল হুর' তথা স্বাধীন দেশপ্রেমিক দল নামে একটা সংগঠন প্রতিষ্ঠা করে এবং মুস্তফা কামেল প্রতিষ্ঠিত আল-হিযবুল ওয়াতানী বা জাতীয়তাবাদী দলের বিরোধিতাই ছিল এদের ব্রত।

ধর্মহীন জাতীয়তাবাদী দলের নেতা

মিশরী জাতীয়তাবাদের ধ্বজাধারী অপর দলটি হিযবুল উম্মাহ বা উম্মাহ পার্টি। মিশরের পাশা আর সামন্ত শ্রেণীর সহযোগিতায় এ দলটি গড়ে উঠে। এদের মতে মিশরের আসল শাসন এখন লর্ড ক্রোমার এর হাতে। সুতরাং তার সঙ্গে সংঘাতের নয়, বরং সহযোগিতার নীতি গ্রহণ করতে হবে। ১৯০৭ সালে মাহমুদ সুলায়মান পাশার নেতৃত্বে হিযবুল উম্মাহ বা উম্মাহ পার্টি প্রতিষ্ঠিত হয়। নিজেদের স্বার্থকে কেন্দ্র করেই এসব পাশা আর সামন্ত শ্রেণীর কর্মকাণ্ড আবর্তিত হয়। কতিপয় দুর্বল ঈমান স্বার্থপর শিক্ষিত ব্যক্তিকেও এরা দলে টেনে আনতে সক্ষম হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব ছিলেন সৈয়দ লুত্‌ফী। 'আল জারীদা' সাময়িকী ছিল এদের মুখপাত্র। পাশা আর সামন্ত শ্রেণী নিছক স্বার্থের খাতিরে উম্মাহ পার্টির আশ্রয় নেয়। অবশ্য সৈয়দ লুত্‌ফী এবং অন্যান্য দার্শনিক এবং সাহিত্যিকরা ছিলেন সামাজিক এবং রাজনৈতিক দর্শনের পতাকাবাহী। এদেরকে মনে করা হতো উম্মাহ পার্টির মূল ভিত্তি। স্বাধীন চিন্তাধারা, ইউরোপের সঙ্গে সহযোগিতা এবং জীবনের সকল ক্ষেত্রে ইউরোপের অন্ধ অনুকরণ ছিল এদের দর্শন। শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি- সকল ক্ষেত্রে এরা মিশরকে ইউরোপের ধাচে গড়ে তোলার আহ্বান জানায়। লুত্‌ফী সৈয়দের নেতৃত্বাধীন এ শ্রেণীকে লর্ড ক্রোমার বলতেন শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর দল এবং এদেরকে মনে করা হতো আগামী দিনে মিশরে ইংরেজদের আশা-আকাংখার প্রতীক হিসাবে। 'আল জারীদা' ইংরেজদের কর্তৃত্বকে 'বাস্তব' মনে করতো। লুত্‌ফী সৈয়দ লিখেন ঃ মিশরী জাতি শান্তি চায়। তারা নিষ্ঠার সঙ্গে ইংরেজকে

www.pathagar.com

ভালোবাসে। আইনতঃ শাসন-কর্তৃত্ব খেদিভ-এর হাতে এবং কার্যতঃ ক্রোমার-এর হাতে। এখন সময় এসেছে উভয় ধরনের কর্তৃত্ব এক স্থানে কেন্দ্রীভূত করার। অর্থাৎ আইনগত কর্তৃত্বও খেদিভ এর পরিবর্তে ইংরেজদের হাতে ন্যস্ত করার সময় এসেছে।"

ইসলামের ভিত্তিতে জাতি আর জাতীয়তা গড়ে তোলার এরা ছিল ঘোর বিরোধী। এ দলের প্রসিদ্ধ নেতা আব্দুল হামীদ যাহরাবী 'আল-জারীদা'য় লিখেনঃ

"হযরত ওমর (রাঃ)-এর ওফাতের পর মুসলমানদের রাজনৈতিক ঐক্য খতম হয়ে গেছে। আর হযরত আলীর (রাঃ) ওফাতের পর তাদের ধর্মীয় ঐক্যও শেষ হয়ে গেছে। ১৩ শত বৎসর পূর্বে যে ঐক্য আর সংহতি বিলীন হয়ে গেছে, এখন কি করে তা পুনরুজ্জীবিত করা যাবে?"

উভয় দলের সংঘাত

এক দিকে ছিল মুস্তফা কামেল, ফরীদ বেজদী এবং আব্দুল আজীজ জাবিশ-এর আল-হিয্বুল ওয়াতানী তথা জাতীয়তাবাদী দল; অন্যদিকে বিভিন্ন শ্রেণী নানা আবরণে ছিল সংঘাতমুখর। কোনটা ছিল 'আল হিযবুল ওয়াতানী আল-হুর' তথা স্বাধীন জাতীয়তাবাদী দল নামে পরিচিত এবং আল-মুকাত্তাম ও আল-মুক্তাতাফ-এর ছদ্মাবরণে স্বার্থসিদ্ধি করছিল। আবার কেউ হিযবুল উম্মাহ বা উম্মাহ পার্টির নামে পরিচিত ছিল এবং 'আল-জারীদার' মাধ্যমে দুনিয়া পূজায় মত্ত ছিল, অথবা শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর দলের অন্তরালে মিশরকে পাশ্চাত্যের রঙ্গে রঙ্গীন করে গড়ে তোলার কাজে সচেষ্ট ছিল। এ দু'টি পরস্পর বিরোধী আন্দোলনে স্পষ্টতঃ পার্থক্য লক্ষণীয় যে, হিয্বুল ওয়াতানী তথা জাতীয়তাবাদী দল এবং মুস্তফা কামেল-এর প্রচার ধারায় আবেগ-উচ্ছ্বাস আর উত্তেজনা ছিল প্রবল। আর হিযবুল উম্মাহ (উম্মাহ পার্টি) বা আল-হিযবুল ওয়াতানী আল্-হুর (স্বাধীন জাতীয়তাবাদী দল) বা মুস্তফা সৈয়দ যুক্তি প্রমাণের আশ্রয় গ্রহণ করে। এরা অতি ধীরে সুস্থে নওজোয়ানদের মধ্যে বস্তুবাদ আর উদারনৈতিক মতবাদের স্পৃহা জাগিয়ে তোলে। মুস্তফা কামেল এবং তাঁর পত্রিকা 'আল-লিওয়া' অতি তিক্ত আর তীব্র ভাষায় ঔপনিবেশিকতার উপর হামলা চালায়। তিনি ছিলেন দ্বীনের ভিত্তিতে মিশরীয় জাতীয়তা গড়ে তোলার প্রবক্তা এবং গোটা মুসলিম জাহানের ঐক্য আর সংহতির স্বপ্নদ্রষ্টা। মিশর আর তুরস্কের মধ্যে সম্পাদিত ১৮৪০ সালের চুক্তি মেনে চলার পক্ষে ছিলেন তিনি। এ চুক্তি অনুযায়ী তুরস্কের কর্তৃত্বাধীনে মিশরের অভ্যন্তরীণ আযাদীর নিশ্চয়তা ছিল। এ চুক্তি অনুযায়ী মিশরের উপর তুরস্কের

www.pathagar.com

কর্তৃত্ব কেবল এতটুকু ছিল যে, মিশর নির্দিষ্ট পরিমাণ কর পরিশোধ করবে এবং মিশরের জন্য তুরস্কের পক্ষ থেকে প্রধান বিচারপতি নিয়োগ করা হবে। কিন্তু উম্মাহ পার্টি এবং স্বাধীন জাতীয়তাবাদী দলের পক্ষ থেকে মুস্তফা কামেলের বিরুদ্ধে অভিযোগ তোলা হয় যে, তিনি ইংরেজ উপনিবেশের অবসান ঘটিয়ে তুর্কী উপনিবেশকে সুদৃঢ় করতে চান। এ কারণে আল-মুকাত্তাম ক্রমাগত এমনসব নিবন্ধ প্রচার করে, যাতে তিনি প্রমাণ করেন যে, তুর্কীরা যালিম আর ইংরেজরা ন্যায়পরায়ণ। মুস্তফা কামেল দ্বীন আর জাতীয়তার মধ্যে বৈপরীত্য স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন ঃ

"ইংরেজরা যখন একই সঙ্গে ন্যাশনালিস্ট এবং প্রোটেস্ট্যান্ট হতে পারে, তখন মুসলমানরা কেন একই সঙ্গে জাতীয়তাবাদী এবং মুসলমান হতে পারবে না?"

ক্ষমতাসীন ইংরেজদের কূটকৌশল

মিশরের অভ্যন্তরে তুরস্কের প্রভাব আর ধর্মীয় আবেগ দুর্বলতর করে তোলাই ছিল ইংরেজদের চেষ্টা। এ কারণে খলীফাতুল মুসলিমীনের সমালোচনায় মুখর যে কোন ব্যক্তির পৃষ্ঠপোষকতা করার জন্য ইংরেজরা প্রস্তুত ছিল। তখন মিশরে আইনগত ক্ষমতা ছিল খেদিভ এর হাতে। এ কারণে ইংরেজরা খেদিভ-এর সমালোচকেরও সহায়তা করতো। যারা ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাতের পরিবর্তে অভ্যন্তরীণ সংশোধনের নীতি গ্রহণ করতো, ইংরেজরা তাদেরও পৃষ্ঠপোষকতা করতো। সুতরাং ইংরেজরা মুস্তফা কামেল এর দুশমন ছিল এ জন্য যে, তিনি দেশপ্রেমের সঙ্গা দিয়ে বলতেন, দেশপ্রেমের অর্থ হচ্ছে মিশর থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করা। ইংরেজরা মক্কার শাসনকর্তা শরীফ হুসাইনের উত্থাপিত আরব খিলাফাত নীতি এ জন্য সমর্থন করতো যে, এর ফলে 'খলীফাতুল মুসলিমীন'-এর মর্যাদা খর্ব হয়। তুর্কী নওজোয়ানদের আন্দোলন 'তুর্কিয়া আল-ফাতাত' এবং আঞ্জুমানে ইত্তেহাদ ও তরক্কীর যেসব লোক তুরস্ক ছেড়ে মিশরে আশ্রয় নিতো, ইংরেজরা তাদেরকে অভ্যর্থনা জানাতো। এসব নওজোয়ান মিশরে আগমন করে সংবাদপত্র প্রকাশ করে এবং সুলতান আব্দুল হামিদের তীব্র সমালোচনা করে। সুলতান আব্দুল হামীদ যখন মিশরের খেদিভ আব্বাসকে লিখেন, এসব পলাতকদেরকে তুরস্কের নিকট প্রত্যর্পণ করার জন্য, তখন ক্রোমার হস্তক্ষেপ করে এবং আব্বাসকে এ কাজ করতে বারণ করে। তেমনি কেউ মিশরের খেদিভ-এর বিরোধিতা করলে ক্রোমার তার পৃষ্ঠে হাত বুলাতো। শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহু এবং খেদিভ আব্বাসের মধ্যকার সম্পর্ক অত্যন্ত তীব্র হয়ে উঠলে

www.pathagar.com

ক্রোমার শায়খ আব্দুহুর প্রতি সমর্থনের নীতি অবলম্বন করে। ক্রোমার-এর সমর্থনের ফলে আব্বাসের বিরোধিতা সত্ত্বেও শায়খ আব্দুহু ফতোয়ার মসনদে আসীন থাকতে সমর্থ হন। উপরন্তু শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহু যেহেতু অভ্যন্তরীণ সংস্কার সংশোধনের পতাকাবাহী ছিলেন, এ কারণেও ক্রোমার তাঁর প্রশংসায় ছিল পঞ্চমুখ। শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর সঙ্গী মুস্তফা ফাহ্মী, রিয়াদ পাশা, সাআদ জগলুল, ফাত্হী জগলুল এবং কাসেম আমীনও একই কারণে ইংরেজদের সমর্থন লাভ করেন। কারণ, এরা ছিলেন খেদিভ বিরোধী এবং মিশরে অভ্যন্তরীণ সংস্কার-সংশোধনের পক্ষপাতী।

মোটকথা, ইংরেজরা একদিকে মিশরী মুসলমানদের দ্বীনি জযবা আর ইসলামী ভাবাবেগকে দুর্বল করতে শুরু করে, যাতে ইংরেজদের নয়া উপনিবেশের অভ্যন্তরে বসবাসকারী মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্ভব না হলেও অন্ততপক্ষে অকার্যকর হয়। অপরপক্ষে তারা এ মানসিকতা গড়ে তোলার চেষ্টা চালায় যে, মিশরীয়রা ফেরাউনের বংশধর। লেবাননীরা ফিনিকী বংশোদ্ভূত। ইরাকীরা ব্যবিলনীয় এবং অশূর জাতির উত্তরসূরী আর হেজাযী বুজুর্গরা হচ্ছেন আরবের মধ্যমণী। আর হেজাযীরাই ইসলামী খিলাফাতের বেশী হকদার। কারণ, হেজাযের পূণ্যভূমি থেকেই ইসলামের উৎপত্তি হয়েছে। তাদের উদ্দেশ্য ছিল আরবরা যাতে যে কোন উপায়ে ওসমানী খিলাফাতের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করে নেয়। তাদের মতে, ত্রুটি-বিচ্যুতি সত্ত্বেও ওসমানী খিলাফাত মুসলমানদেরকে ইসলামের নামে ঐক্যবদ্ধ করতে সক্ষম। ইংরেজরা খেদিভ আব্বাসকে লাঞ্ছিত করার অভিযান চালনা শুরু করে। স্বয়ং মিশরের অভ্যন্তরে এমনসব লোক তাদের হস্তগত হয়, যারা আব্বাসের দোষত্রুটি প্রচার করতো। এই অনুভূতি তাদের জাগেনি যে, আব্বাসের দুর্বলতা মিশরে ইংরেজদের থাবা সুদৃঢ় করে তুলবে।

এ যুগের কবিদের মধ্যে নসীম আর ওলীউদ্দীনের যে স্থান ছিল, তা কারো কাছেই গোপন নয়। কিন্তু এরা ছিলেন সেই কবি, যারা কবিতা আর সাহিত্যে ইংরেজদের রাজনীতি প্রচার করেন। হিন্দুস্তানে কিছুসংখ্যক কবি-সাহিত্যিক ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদীদের সেবায় যেমনিভাবে নিজেদের সাহিত্যিক প্রতিভা উৎসর্গ করেছিল, মিসরের এসব কবি-সাহিত্যিকরাও ঠিক সেই একই চরিত্রের পরিচয় দেয়। অবশ্য এ দুই বিপরীতধর্মী আন্দোলন একদিকে মুস্তফা কামেল-এর ইসলামী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন, অন্যদিকে ক্রোমারের আশীর্বাদপুষ্ট মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন– এ দু'আন্দোলনের তৎপরায় একদিকে মিশরের প্রাচীন ইতিহাস এবং ফেরাউনী সভ্যতা পুনরুজ্জীবিত করা হয়। অন্যদিকে সেখানে ইসলামের ইতিহাস এবং আরব সভ্যতার উজ্জ্বল দিকও উজ্জীবিত করে তোলা

www.pathagar.com

হয়। নাসীম, ওলীউদ্দীন এবং মুস্তফা সৈয়দের মতো উম্মাহ পার্টি এবং স্বাধীন জাতীয়তাবাদী দলের নেতারা এসব ভালো কাজ আনজাম দিয়ে যাচ্ছিলেন। তেমনি অন্যদিক থেকে মুস্তফা কামেল ও শাওকী এবং বারুদীর মতো কবি এবং আব্দুল আজিজ জাবিশ ও ফরীদ বেজদী আফেন্দীর মতো নামকরা লেখকরা বুদ্ধিজীবী-সাহিত্যিকের সমর্থন লাভ করতে সক্ষম হয়েছেন। পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, মিশরের জাতীয়তাবাদী আন্দোলন যুক্তি প্রমাণ সহকারে নিজদেরকে মিশরের জনগণের সম্মুখে উপস্থাপন করছিলেন। পক্ষান্তরে ইসলামী জাতীয়তাবাদী আন্দোলন ছিল নিছক জোশ আর জযবার নাম। এ আন্দোলনের চিন্তাধারার দিকটা তেমন স্পষ্ট এবং সুদৃঢ় ছিল না।

অমুসলিমদের ভূমিকা

এ দুটি বিপরীতমুখী আন্দোলন এতটা এগিয়ে যায় যে, ১৯১১ সালে উভয়ের মধ্যে তুমুল সংঘাত বেধে যায়। বিষয়টা ইসলামী জাতীয়তা আর মিশরী জাতীয়তার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না। বরং মুসলমান আর কিবতীর প্রশ্ন দেখা দেয়। মুসলমান আর কিবতীদের মধ্যে চরম টানাপোড়ন শুরু হয়ে যায় এবং আযাদী আন্দোলনের গতি ইংরেজদের থেকে সরে একে অন্যের বিরুদ্ধাচরণের দিকে মোড় নেয়। ফলে স্বয়ং মিশরের অস্তিত্বই চরম হুমকীর সম্মুখীন হয়ে পড়ে। এই তামাশা দেখে ইংরেজরা কেবল মজাই উপভোগ করছিল না, বরং তলে তলে তাতে আরো হাওয়া দিচ্ছিল। ফাটল ধরাও আর শাসন চালাও (Divide and Rule)-এ নীতি তারা সর্বত্র অবলম্বন করে। এ কথা প্রমাণ করার অপেক্ষা রাখে না যে, মুসলমান আর কিবতীরা যুগ যুগ ধরে মিশরে বসবাস করে আসছে এবং উভয়ের পারস্পরিক সম্পর্কও ছিল ভালো। কিন্তু ইংরেজরা তাদের নয়া উপনিবেশে সর্বদা এ চেষ্টা চালায় যে, কিভাবে সংখ্যালঘুদেরকে উত্তেজিত করে তোলা যায়। তারা সংখ্যালঘুদের পৃষ্ঠপোষকতা করে এবং তাদের দ্বারা সংখ্যাগুরুদেরকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা চালায়। ফ্রান্সও সিরিয়ায় মুসলিম সংখ্যাগুরুর সঙ্গে এ আচরণই করেছে। এ ঘৃণ্য নীতি অনুযায়ী ইংরেজরা মিশরে পদ স্থাপন করেই, সেখানকার কিবতী অধিবাসীদেরকে উত্তেজিত করা শুরু করে। লর্ড ক্রোমার এর ভাষায়, কিবতীরা আশা করতে শুরু করে যে, বর্তমানে ইংরেজদের শাসনামলে তাদের স্থান ও মান আরো অনেক উন্নত হবে। একদিকে মুসলমানরা ক্ষমতাসীন ইংরেজদেরকে বয়কট করার নীতি অবলম্বন করে, অন্যদিকে কিবতী অধিবাসীরা এ পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে শিল্প এবং অর্থনীতির

www.pathagar.com

ক্ষেত্রে স্বার্থসিদ্ধির চেষ্টা শুরু করে। তারা কেবল পদ আর পদবীতে হাত রঞ্জিত করা নয়, বরং অর্থ সম্পদ দ্বারাও ঝুলি পুরা করার কাজে আত্মনিয়োগ করে। এটা মুসলমানদের অন্তরে তাদের বিরুদ্ধে ভুল ধারণার জন্ম দেয়। ইংরেজদের সঙ্গে সহযোগিতাকে মুসলমানরা গাদ্দারী মনে করতো আর কিবতী তথা মিশরীয় খৃষ্টানরা এ সহযোগিতাকে গনীমত জ্ঞান করতো। এখান থেকেই উভয় জাতির মধ্যে খারাপ সম্পর্কের সূত্রপাত হয়। ইংরেজদের দাপটে মুসলমানদেরকে দাবায়ে রাখা হয়, আর কিবতীরা হয়ে উঠে একেবারে আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ। বিষয়টা রাজনৈতিক বিরোধ থেকে অগ্রসর হয়ে ধর্মীয় বিরোধের রূপ পরিগ্রহ করে। এবং প্রশ্ন উঠে, কে গদ্দার আর কে ওফাদার! ১৮৭৭ সালে কিবতীদের প্রথম সংবাদপত্র 'আল-ওয়াতান' (স্বদেশ ভূমি) প্রকাশিত হয়। তাদের দ্বিতীয় সংবাদপত্র 'ছহীফায়ে মিশর' প্রকাশিত হয় ১৮৯৫ সালে। এ দুটি সংবাদপত্র এ সংঘাতে অগ্রসর ভূমিকা গ্রহণ করে এবং মুসলমানদের বিরুদ্ধে কিবতীদেরকে যতটা উত্তেজিত করা সম্ভব, সবই করে। এ পত্রিকাদ্বয় কিবতীদেরকে একটা পৃথক জাতি হিসাবে উপস্থাপন করে। বরং এমন দাবীও তোলা হয় যে, কিবতীরা হচ্ছে ফেরাউনের বংশধর। এরাই দেশের আসল মালিক। এদের দেহে বিদেশী রক্তের (আরবদেরকে বিদেশী রক্ত বলা হচ্ছে) বিন্দুমাত্র সংমিশ্রণও নেই। মিশরের জনগণ যে বিষয়টাকে পছন্দ করতো না, এ পত্রিকাদ্বয় তাকেই ভালো বলে অভিহিত করতো। ১৯০৯ সালে মিশরে প্রধানমন্ত্রীর পদ চলে যায় জনৈক কিবতীর হাতে, যার নাম ছিল পিটার্স ঘালী। ১৮৮১ সালে আ'রাবী পাশার বিদ্রোহকালে দেশে যে প্রেস অর্ডিন্যান্স জারী করা হয়, পিটার্স ঘালী তা পুনর্বহাল করে। মিশরের সমস্ত মুসলিম পত্রপত্রিকা এ অর্ডিন্যান্স পুনর্বহালের প্রতিবাদ জানায়। কিন্তু কিবতী পত্রপত্রিকাসমূহ কেবল একে স্বাগতই জানায়নি, বরং এর বিরুদ্ধে বিক্ষোভকারীদেরকে পাগল এবং বিপর্যয় সৃষ্টিকারী বলেও আখ্যায়িত করে। ১৯১০ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট টিওডোর রুজভেল্ট মিশর সফর করেন। কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ে তিনি যে ভাষণ দেন, তা ছিল মিশরের জনগণের আশা-আকাংখার পরিপন্থী। মিশরে তখন শাসনতন্ত্রের দাবীতে আন্দোলন চরমে পৌঁছে। মিঃ রুজভেল্টের ভাষণে শাসনতান্ত্রিক আন্দোলনেরও বিরোধিতা করা হয়। এ কারণে মিশরের জনগণ এ ভাষণের বিরুদ্ধে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। কিন্তু পত্রপত্রিকা সে ভাষণকে অভিনন্দিত করে এবং রুজভেল্টকে মিশরের সবচেয়ে বড় কল্যাণকামী বলে বর্ণনা করে। কিবতী পত্রপত্রিকার এসব ভূমিকা কিবতীদের সম্পর্কে মুসলমানদের অন্তরে অবিরাম খারাপ ধারণা আর সন্দেহ-সংশয়ের উদ্দীপনার বীজ বপন করে।

www.pathagar.com

গৃহযুদ্ধ

চক্রান্ত আর ষড়যন্ত্রে ভরা ছিল পিটার্স ঘালীর গোটা রাজনৈতিক জীবন। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পূর্বে পররাষ্ট্রমন্ত্রীও ছিলেন ইনি। পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিসাবে ১৮৯৯ সালে তিনি ইংরেজদের সঙ্গে সুদান চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন। এ চুক্তি অনুযায়ী সুদানের শাসনকার্যে ইংরেজদেরকে সরাসরি অংশগ্রহণের অধিকার দেয়া হয়। এমন আরো অনেক ঘটনা পাওয়া যায়, যাতে একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, তিনি ছিলেন ইংরেজদের ক্রীড়নক। জীবনের শেষদিকে ইনি এ চেষ্টাও চালান, যাতে সুয়েজ খাল সম্পর্কে ইংরেজদের সঙ্গে কৃত চুক্তির মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয় এবং চুক্তির মেয়াদ যাতে ২০০৮ সালে শেষ হয়। ১৯১০ সালের ২০ ফেব্রুয়ারী জাতীয়তাবাদী দলের (হিযবুল ওয়াতানী) সক্রিয় কর্মী ইবরাহীম নাসিফ পিটার্স ঘালীকে হত্যা করে। ফলে মুসলমান আর কিবতীদের মধ্যে যুদ্ধ বেধে যায়। সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে যুদ্ধ ছড়িয়ে পড়ে অলিগলিতে। কিবতীরা এ যুদ্ধে বৃটিশ পত্রপত্রিকার নিকটও সাহায্যের আবেদন জানায়। ডেইলী নিউজ এ যুদ্ধে তাদের পূর্ণ সহায়তা করে। কিবতী নেতৃবৃন্দ বৃটেন সফরেও গমন করে এবং তারা যে মযলুম, বৃটিশ কর্তৃপক্ষকে তা বুঝাবার চেষ্টা চালায়। ১৯১০ সালের ৫ই মার্চ তারা আসয়ুতে এক মহা সম্মেলনের আয়োজন করে। এ সম্মেলনে তারা সরকারের নিকট বেশকিছু দাবী দাওয়া পেশ করে। এসব দাবী আগুনে তেল সংযোগের কাজ করে এবং ধর্মীয় যুদ্ধ আরো বিস্তৃতি লাভ করে। উভয় ধর্মের অবিবেচক নেতারা আর ইংরেজের গোয়েন্দারা এ যুদ্ধকে চরমে নিয়ে যাওয়ার কাজে সর্বশক্তি নিয়োগ করে। রিয়াদ পাশা প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব গ্রহণ করে অনেক চেষ্টা-চরিত্র চালিয়ে যুদ্ধ বন্ধ করতে সক্ষম হন। ১৯১১ সাল নাগাদ পরিস্থিতি খানিকটা নিয়ন্ত্রণে আসে এবং ঐক্য স্থাপন সম্পর্কে কথাবার্তাও চলে। কিন্তু মিশরের সমাজ জীবনে এ যুদ্ধের সুদূরপ্রসারী প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। কেবল মুসলমান আর কিবতীদের মধ্যেই নয়, বরং প্রাচীন আর আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত মুসলমানদের মধ্যেও এ যুদ্ধ নানা ভুল বুঝাবুঝির জন্ম দেয় এবং ভবিষ্যতের সংস্কারকদের জন্য অনেক সমস্যার দ্বার উন্মোচন করে দেয়।

রাজনীতিক আর সমাজ সংস্কারক

উপরের আলোচনায় আমরা ইঙ্গিত করেছি যে, মিশরীয় নেতৃবৃন্দের মধ্যে একটা শ্রেণী এমনও ছিল, যারা রাজনৈতিক আন্দোলনে অংশগ্রহণ এবং বিশেষ

www.pathagar.com

করে ইংরেজ বিতাড়নের বিষয়টাকে তেমন গুরুত্ব দিতেন না। এ শ্রেণীকে আমরা রাজনৈতিক শ্রেণী না বলে সমাজ সংস্কারক শ্রেণী বলবো। তখন তাদেরকে সমাজ সংস্কারকই বলা হতো। রাজনীতিকরা বলতেন যে, মিশরের আসল বিপদ হচ্ছে বিদেশী হস্তক্ষেপ। এ কারণে বিদেশী হস্তক্ষেপ থেকে মুক্তিই হচ্ছে এ বিপদের আসল চিকিৎসা। অন্যদিকে সমাজ সংস্কারকরা বলতেন যে, বিদেশী হস্তক্ষেপ তথা ইংরেজ উপনিবেশ হচ্ছে সামাজিক বিকৃতির মূল কারণ। সুতরাং সামাজিক বিকৃতি দূর করতে পারলে বিদেশী হস্তক্ষেপ আপনাআপনিই দূর হয়ে যাবে। এখানে একথা বলাও অপ্রাসঙ্গিক হবে না যে, লর্ড ক্রোমার রাজনৈতিক চিন্তাধারার বিপরীতে সমাজ সংস্কারকদের দর্শনকে উৎসাহিত করছিলেন। মতের এই মিলের কারণেই শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর সঙ্গে লর্ড ক্রোমারের এত ভালো সম্পর্ক ছিল। এখানে সমাজ সংস্কারকদের সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোচনা করা আবশ্যক। তাদের মধ্যেও স্পষ্টত দুটি শ্রেণী দেখা যায়। একটা শ্রেণী সমাজ সংস্কার বলতে আধুনিকতা বুঝতো এবং এরা ছিলেন পাশ্চাত্য সভ্যতাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করার পক্ষপাতি। অপর একটা শ্রেণী ইসলামী ঐতিহ্য এবং প্রাচ্য ও স্বীয় রীতিনীতি গ্রহণ করার প্রতি সমভাবে গুরুত্বারোপ করতো। এ দুই সংস্কার কর্মসূচী রাজনৈতিক অঙ্গনেও প্রভাব বিস্তার করছিল। মিশরীয় জাতীয়তার সমর্থক শ্রেণী পাশ্চাত্য সভ্যতার সমর্থক রাজনীতিকদের প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে। আর ইসলামী জাতীয়তার সমর্থকরা সমর্থন জ্ঞাপন করে প্রাচ্য রীতিনীতির সমর্থক গোষ্ঠীর প্রতি। শিল্প-সাহিত্যের অঙ্গনেও এ পার্থক্য দেখা দেয়। একটা শ্রেণী শিল্প-সাহিত্যের নীতি ইউরোপের নিকট থেকে গ্রহণ করার পক্ষপাতি; আর অপর শ্রেণী প্রাচীন আরব এবং প্রাচ্য রীতিনীতির মধ্যে নিজেদের শিকড় সন্ধান করে। শিক্ষার ক্ষেত্রেও এ দুটি চিন্তাধারা দেখা দেয়। একদিকে ছিল আধুনিকতাবাদী তথা পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুসারী শ্রেণী। শিক্ষার প্রাচীন ঐতিহ্য সম্পর্কে এরা মানুষকে বিদ্বিষ্ট করে তোলে এবং বলে, যখন যেমন বাতাস, তখন তেমন চলতে হবে। বাতাসের গতিরোধ করার চেষ্টা না করে তার সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলাই বুদ্ধিমানের কাজ। অপরপক্ষে ছিল এমন একটা শ্রেণী, যারা পোশাক-আশাক, সামাজিক রীতিনীতি এবং জীবন ধারায় প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুসারী ছিল।

শাসক শ্রেণীর মোনাফেকী

এই দ্বিবিধ চিন্তাধারা মিশরীয় সমাজকে বিভক্ত করে রাখে এবং উভয় শ্রেণীর মধ্যে ঘৃণা-বিদ্বেষের একটা অচলায়তন জন্ম দেয়। অবশ্য এই দুই শ্রেণীর মধ্যে

www.pathagar.com

একটা তৃতীয় শ্রেণীরও উদ্ভব হয়, যারা এই দুই শ্রেণীর মধ্যে হাস্যকর জোড়া লাগায় এবং সমাজ জীবনে জন্ম দেয় মোনাফেকীর। খেদিভ আব্বাসের প্রাসাদ থেকেই এই মোনাফেকীর সূত্রপাত হয়। খেদিভ আব্বাস আবেদীন প্রাসাদে রমজান মাসে তাফসীরুল কুরআনের আয়োজন করে ইসলাম এবং প্রাচ্যের অনুসারী দলকে খুশী করার চেষ্টা করতো। আবার বৎসরে একবার রাজপ্রাসাদে নাচ-গানের আয়োজন করে আধুনিকতাবাদীদের সমর্থনও আদায় করার চেষ্টা করতো। কাসরে আবেদীন থেকে এই মোনাফেকীর সূচনা হয়ে মিশরী সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। শাওকীর মতো মহান মিশরীয় কবি, যাকে বলা হয় মিশরের আল্লামা ইকবাল, তিনি রাসূলে পাকের শানে নজীর বিহীন না'ত পেশ করতেন আবার গানের অনুষ্ঠানে প্রাণ খুলে গানও গাইতেন।

আধুনিকতাবাদীদের চরিত্র

পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীদের বেশীরভাগ ছিল সিরিয়া আর লেবাননের খৃষ্টানরা, যারা মিশরে এসে বসবাস করে। কিছু মিশরীয়ও ছিল, যারা ইউরোপে শিক্ষা লাভ করে, বা মিশনারী স্কুল থেকে শিক্ষা গ্রহণ করে বেরিয়ে আসে। সিরিয়া আর লেবাননী খৃষ্টানরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল। একটা শ্রেণীর উপর ছিল ইংরেজদের শিক্ষা-সংস্কৃতির প্রভাব, আর অপর শ্রেণী ছিল ফরাসী প্রভাবাধীন। মিশরের স্বনামধন্য দৈনিক পত্রিকা 'আল-আরাম ছিল ফরাসী প্রভাবের প্রতিনিধি এবং আল-মুকাম্মাও ও আল-মুকতাতাফ ছিল বৃটিশ প্রভাবাধীন। মিশরের আধুনিকতাবাদীদের অবস্থা ছিল বিস্ময়কর। চিন্তা-চেতনা আর মন-মানসিকতার যে স্তরে তারা নেমে এসেছিল, মিশরের ঐতিহাসিক মুহাম্মদ মুহাম্মদ হোসাইনের ভাষায় তা শ্রবণ করুন ঃ

"মিশরের যে শ্রেণীটি পাশ্চাত্য সভ্যতার ধ্বজাধারীতে পরিণত হয়েছে; তারা ছিল সেসব লোক, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার রস আস্বাদন করেছিল। কারণ, তারা হয় ইউরোপে জীবনের কিছু অংশ অতিবাহিত করেছে, অথবা ইউরোপীয় ধারার স্কুলে শিক্ষা লাভ করেছে। তারা নিজেদের সম্মুখে যে অনুকরণীয় দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছিল, তা সে সংস্কৃতি থেকে গৃহীত ছিল, ইসলাম বা আরবের সঙ্গে যার দূরতম সম্পর্কও ছিল না। ইংরেজ এবং ফরাসীদের যতটা ইতিহাস তারা জানতো, তার তুলনায় মুসলমান বা আরবদের ইতিহাসের এক দশমাংশও তাদের জানা ছিল না। ইউরোপের গীর্জা আর তার ধর্মীয় বিরোধের বিষয়ে তারা ভালোই জানতো, কিন্তু ইসলামের ফিক্‌হ্ বিষয়ে তাদের জ্ঞান না থাকার মতো ছিল। এরা ইসলামী

www.pathagar.com

এবং আরব সাহিত্যের নামকরা ব্যক্তি সম্পর্কে ছিল একেবারেই অজ্ঞ। অবশ্য ইউরোপীয় সাহিত্য এবং চিন্তাধারার উল্লেখযোগ্য ব্যক্তিত্ব আর কবি-সাহিত্যিকদের জীবন কথা তাদের ভালোভাবে মুখস্ত ছিল। নিজেদের পারিবারিক জীবনে তারা পাশ্চাত্যের রীতিনীতির অনুকরণ করতো, তারা নিজেদের সন্তানদেরকে লালন-পালনের জন্য তুলে দিতো ইউরোপীয় ললনাদের হাতে। এ কারণে পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাদের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য আর আত্মার সম্পর্ক ছিল সুগভীর। আর ইসলাম এবং পাশ্চাত্যের সঙ্গে তাদের সকল প্রকার সম্পর্ক ছিল শিথিল। পাশ্চাত্যের লেখক শ্রেণী প্রাচ্যবাসীদের পশ্চাতপদতার কারণ বলে উল্লেখ করে ইসলামের সঙ্গে তাদের সম্পর্ককে। মিশরের আধুনিকতাবাদীদের মন-মানসে এ কথাই বদ্ধমূল হয়ে দাঁড়ায়। তারা বলে, ইসলাম একটা অসার ধর্ম। কয়েক শতাব্দী পূর্বে এ ধর্ম বদ্দুদের সমাজকে সংগঠিত করেছে; কিন্তু বিংশ শতাব্দীর আধুনিক সমাজের নেতৃত্ব দানের ক্ষমতা ইসলামের নেই।" মোহাম্মদ মোহাম্মদ হোসাইন রচিত সমকালীন সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী ধারা -

الاتجاهات الوطنية في الادب المعاصر পৃষ্ঠা - ২৫৯-২৬০

লর্ড ক্রোমার মিশরীয়দের মধ্যে এসব চিন্তাধারা লালন করেন। তিনি বলতেন, যেসব মুসলমান ইউরোপীয় চরিত্রে বিভূষিত নয়, তারা মিশরে শাসনকার্য পরিচালনার যোগ্য নয় (Modern Egypt P. 569-570)। হাফেজ ইবরাহীমের মতো নামকরা কবিও ১৯০৬ সালে মিশরে মার্কিন গার্লস কলেজের একটা অনুষ্ঠানে পঠিত কবিতায় বলেন ঃ

ليتنا نقتدي بكم او نجاريكم عسي نسترد ما كان ضاعا

- হে পাশ্চাত্যবাসী! আমরা যদি তোমাদের অনুসরন করতাম, বা অন্তত তোমাদের সহযাত্রী হতাম, তবে হয়তো আমরা হারানো গৌরব ফিরে পেতাম!

পাশ্চাত্য সভ্যতার সয়লাব

একদিকে ছিলো উপরোক্ত শ্রেণী অর্থাৎ লেবানন ও সিরিয়ার খৃষ্টানরা আর মিশরের আধুনিকতাবাদীরা, যারা পাশ্চাত্য সভ্যতার অনুবর্তন আর ফিরিঙ্গীদের অন্ধ অনুকরণের প্রচার করছিল জোরেশোরে এবং মিশরী নওজোয়ানদের মন-মানসকে অনুপ্রাণিত করে তুলছিল নিজেদের কথার তুবড়ি দ্বারা; অন্যদিকে মিশরের উপর পাশ্চাত্যের বস্তুগত উন্নতির প্রভাব বৃদ্ধি পেয়ে চলছিল নানাভাবে। ১৮৮৪ সালে টেলিফোনের ইংরেজ কোম্পানী স্থাপিত হয় এবং ১৮৯৬ সালে

www.pathagar.com

কায়রোয় সিনেমা হলের উদ্বোধন করা হয়। ১৮৯৭ সালে ট্রাম লাইন স্থাপন করা হয় এবং ১৮৯৮ সালে ন্যাশনাল ব্যাংক স্থাপিত হয়। ন্যাশনাল ব্যাংক কারেন্সী নোট ইস্যু করে। সঙ্গে সঙ্গে দেশের সর্বত্র মদ্যশালা খোলা হয়। এমনকি গ্রামেগঞ্জে এবং শ্রমিক কলোনীতেও পানশালা খোলা হয়। বড় বড় শহরে লাইসেন্সপ্রাপ্ত গণিকালয় খোলা হয়। ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে মানুষ প্রকাশ্য অপকর্মে লিপ্ত হতে শুরু করে। তাদের কাছে ব্যক্তি স্বাধীনতার অর্থ ছিল মানুষ সকল বাধ্যবাধকতামুক্ত। ধর্মীয় রীতিনীতি, সামাজিকতা আর দেশাচার কোন কিছুই মানতে সে বাধ্য নয়। মোটকথা, নানা ধরনের আন্দোলনের আকারে পাশ্চাত্য সংস্কৃতি এবং পাশ্চাত্য মানসিকতা ছড়িয়ে পড়ে। এসব আন্দোলনের মধ্যে তিনটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

এক ঃ ব্যক্তি স্বাধীনতার আন্দোলন এবং পাশ্চাত্য ধারার পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার দাবী।

দুই ঃ ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক করার আন্দোলন।

তিন ঃ নারী স্বাধীনতা আন্দোলন।

এ তিনটি আন্দোলন সম্পর্কে পৃথক পৃথকভাবে আলোচনা করলে আমাদের বক্তব্য স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

পার্লামেন্টারী বিধান দাবী

প্রথম আন্দোলনটি ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতা আর পার্লামেন্টারী বিধানের দাবীদার। মিশরের প্রায় সকল নেতাই ছিলেন এ আন্দোলনের সমর্থক। এদের মধ্যে মুস্তফা কামেল এর মতো জাতীয়তাবাদী নেতাও ছিলেন, আবার লতফী সৈয়দের মতো ধর্মহীন গণতন্ত্রবাদীও।মূলত এরা ছিলেন ফরাসী বিপ্লব আর ফরাসী চিন্তাধারা দ্বারা দারুণভাবে প্রভাবিত। আর ফরাসী বিপ্লবের দাবীও এরাই তোলেন অর্থাৎ সাম্য মৈত্রী ও স্বাধীনতা ছিল এদের দাবী। ফ্রী মেসনেরও এ দাবী ছিল। বরং ফ্রী মেসনের লোকজন এবং ইহুদীদের মাধ্যমে ফরাসী বিপ্লবের নায়কদের নিকট এ দাবী পৌছে (ফ্রী ম্যাসনের কল্যাণ গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। পৃষ্ঠা ৪, ৪৯, ৮৯ এবং ১৩৩)। মুস্তফা কামেল এবং তাঁর সমর্থক কবি-সাহিত্যিকরা পার্লামেন্টারী বিধান প্রবর্তনের দাবী তোলে এবং এজন্য অব্যাহত চেষ্টা চালায়। অবশেষে ১৯০৭ সালের মার্চ মাসে সরকারের নিকট সংবিধান আর পার্লামেন্টারী ব্যবস্থার দাবী পেশ করা হয়। মিশরের ইতিহাসে এটা ছিল একটা দুঃসাহসী

www.pathagar.com

পদক্ষেপ। ১৯০৭ সালে লর্ড ক্রোমারকে ইংল্যান্ডে তলব করে নেয়া হয়। এর কিছুদিন পর তুরস্কে বিপ্লব সংঘটিত হয় এবং ১৯০৮ সালে ওসমানী সংবিধান জারী করা হয়। এর ফলে মিশরীয় নেতারা সাহস পান। ১৯০৮ সালের পয়লা ডিসেম্বর শাসনতান্ত্রিক মজলিশে শূরাও পার্লামেন্টারী বিধানের দাবী জানায়। খেদিভ আব্বাস আর ইংরেজদের চেষ্টায় এ আন্দোলন জোরদার হয়ে উঠে। এ সময় আবদুর রহমান কাওয়াকেবী রচিত গ্রন্থ 'স্বৈর শাসনের প্রকৃতি' মিশরের রাজনীতিতে বেশ প্রভাব ফেলে। ১৮৪৮ সালে আলেপ্পোয় আল কাওয়াকেরীর জন্ম। সেখানে তুর্কী শাসকদের নির্যাতনে তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে উঠলে নানা দেশ ঘুরে অবশেষে তিনি মিশরে পৌছেন। সেখানে তিনি দুটি গ্রন্থ রচনা করেন। একটি উম্মুল কোরা ১৮৯৯ সালে এবং অপরটি সৈর শাসনের প্রকৃতি (আরবী নাম তাবায়েউল ইস্তিবদাদ) ১৯০১ সালে। ১৯০২ সালে মিশরে তার মৃত্যু হয়। তার বিস্তারিত জীবনী জানার জন্য ডঃ আহমদ আমিন রচিত, য়ুআ'মাউল ইসলাম ফিল আসরিনল হাদীস (আধুনিক কালের মুসলিম নেতা) গ্রন্থ দ্রষ্টব্য। এ গ্রন্থে আল-কাওয়াকেবী সবিস্তারে আলোচনা করেন যে, স্বৈর শাসন আর একনায়কতন্ত্র মানুষের চরিত্র ধ্বংস করে, দ্বীনকে বিনষ্ট করে এবং মানসিক বিনাশ সাধন করে। এ ব্যবস্থা মানুষকে চতুষ্পদ জন্তুর চেয়েও নিকৃষ্ট করে তোলে। জাতি এ বিধানের অধীনে সত্যিকার মান-মর্যাদা কিছুতেই লাভ করতে পারে না। গ্রন্থটি প্রথমে আলী ইউসুফ সম্পাদিত সাময়িকী আল-মুয়াইয়্যেদ-এ ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। পরে তা গ্রন্থাকারে প্রকাশ করা হয়। আল-কাওয়াকেবী ছিলেন উঁচ মানের আরবী সাহিত্যিক। তাঁর এ গ্রন্থ মিশরের সমাজ আর রাজনৈতিক অঙ্গনে বিরাট তোলপাড় সৃষ্টি করে। স্বৈরশাসন আর একনায়কত্বের বিরুদ্ধে সৃষ্টি করে বিরাট উত্তেজনা।

ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক করার আন্দোলন

এ সময় অন্য যে আন্দোলনটি দানা বেঁধে উঠে, তা ছিল ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক করার আন্দোলন। আধুনিকতাবাদীদের পাশ্চাত্য প্রীতি ছিল এ আন্দোলন গড়ে উঠার কারণ। এরা পাশ্চাত্য ধর্মের ইতিহাস এবং গীর্জা আর রাষ্ট্রের সংঘাতের কাহিনী পাঠ করেছিল আর সেসব দ্বারা প্রভাবিত ধর্মীয় অনুষ্ঠান আর পালা-পার্বনের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে রাখতে চাইতো। তাদের মন-মানসে এ কথা বদ্ধমূল হয় যে, মধ্য যুগে ইউরোপে যে পরিস্থিতি বিরাজমান ছিল, বর্তমানে মিশরে সে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। সুতরাং সে পরিস্থিতি থেকে উদ্ধার পেতে

www.pathagar.com

হলে মিশরেও পাশ্চাত্যের উপস্থাপিত সমাধান অর্থাৎ ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক করার নীতি অবলম্বন করতে হবে। ডঃ মোহাম্মদ মোহাম্মদ হোসাইন লিখেন ঃ

যারা ইসলামের প্রবক্তা ছিলেন, তারা ছিলেন সেসব মুসলিম দেশের সদস্য, যা পশ্চাদপদতা আর অজ্ঞতার শিকারে পরিণত হয়েছিল -আধুনিকতাবাদীদের মনে এ ভুল ধারণা আরো বদ্ধমূল করে তোলে। এ কারণে তাদের চিন্তাধারা উপহাসের বস্তুতে পরিণত হয়। সাংস্কৃতিক দেউলিয়াপনার কারণে এরা অধিকন্তু না জেনে না বুঝে কল্যাণকর জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিরুদ্ধাচরণ করতে শুরু করে। এরা মনে করে, এসব জ্ঞান-বিজ্ঞান বুঝি ধর্মের বিরোধী! উপরন্তু খেদিভ ইসমাঈলের শাসনামলে এবং বিশেষ করে ইংরেজ ঔপনিবেশিক যুগে সরকারী চাকুরীর ক্ষেত্রে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়, যার ফলে ধর্মীয় শিক্ষায় শিক্ষিতরা সংস্কারের ক্ষেত্র থেকে বিতাড়িত হয়ে পড়ে। ফলে তারা পিছিয়ে পড়ে জীবনের কাফেলা থেকে। তাদের কর্মের বৃত্ত মসজিদের অভ্যন্তরে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। সরকারী পদ আর সামাজিক ভূমিকা পালনের উপায়-উপকরণ পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত শ্রেণীর হাতে এসে পড়ে। আর এরা যে রকম শিক্ষাদীক্ষা পেয়েছে, সেভাবে সামাজিক আর সাংস্কৃতিক জীবন গড়ে তোলার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণে তারা যা কিছু শিখতে পেরেছে, তন্মধ্যে দুটি বিষয় ছিল প্রধান। এক ঃ ধর্মানুরাগীদেরকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। দুই ঃ ধর্মীয় বিষয় নিয়ে উপহাস করা। কিছু গোপন হস্ত এ মানসিকতাকে অব্যাহত উৎসাহ যোগাচ্ছিল আর মিথ্যা আর ভূয়া কথা রচনা করে তা রটনা করছিল। বিশেষ করে এক্ষেত্রে বিশ্ব ইহুদীবাদ ছিল সবচেয়ে সক্রিয় (সাম্প্রতিক সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী ধারা, পৃষ্ঠা-২৭৫-৭৬)।

মূল লক্ষ্য ঃ খিলাফতের অবসান

ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক করার আন্দোলনের মূল টার্গেট ছিলেন ওসমানী খলীফা সুলতান আবদুল হামীদ খান। যুলুম-নির্যাতনের যে ভয়ঙ্কর চিত্র অঙ্কন করা হচ্ছিল, তা করা হচ্ছিল সুলতান আব্দুল হামীদ খানকে সামনে রেখেই। সুলতান আব্দুল হামীদ খানের কাছে কেবল রাজনৈতিক ক্ষমতাই ছিল না, বরং খলীফাতুল মুসলিমীন হিসাবে তিনি ধর্মীয় ক্ষমতারও অধিকারী ছিলেন। ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক করার আন্দোলনের উদ্দেশ্য ছিল দু'ধরনের ক্ষমতার মধ্য থেকে একটা তাঁকে ছাড়তে হবে। আরব নেতৃবৃন্দের দাবী ছিল, রাজনৈতিক ক্ষমতা সুলতানের কাছে থাকুক, আর ধর্মীয় ক্ষমতা অর্থাৎ খিলাফাত লাভ করুক আরবরা। কারণ, ধর্ম সম্পর্কে আরবরা বেশী বুঝে। পাশ্চাত্যের উদারনীতির

www.pathagar.com

প্রভাবে তুর্কী নেতারা ছিল প্রভাবিত। এ কারণে তারা ধর্মের মূলোৎপাটন করতে চায়। এ বিষয়ে যতো সাহিত্য প্রকাশ পায়, তা ছাপা হয় মিশরে। ওসমানী সাম্রাজ্যের অধীনে কোথাও তা ছাপার অবকাশ ছিল না। এসব সাহিত্যের বেশীরভাগ লেখক ছিল লেবানন এবং সিরিয়ার; কিন্তু সেসব ছাপা আর প্রচার করা হতো মিশরে। ধর্ম ও রাজনীতি পৃথক করার বিষয়ে সিরীয়দের যেসব পুস্তক প্রকাশ পায়, তার মধ্যে একটা ছিল আব্দুর রহমান আল-কাওয়াকেবীর উম্মুল কোরা। এ গ্রন্থে তিনি প্রস্তাব পেশ করেন যে, খিলাফাত আরবদেরকে দেয়া হোক, আর সালতানাত তুর্কীদের কাছে থাকুক। লেখক এর স্বপক্ষে যুক্তি দেন যে, তুর্কীরা ধর্মের উপর রাজনীতিকে প্রাধান্য দেয়। কেবল মুসলমানদেরকে খুশী করার জন্যই ধর্মের প্রতি তাদের আগ্রহ। আল-কাওয়াকেবীর নিষ্ঠা-আন্তরিকতা আর ধর্মীয় আবেগে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু আরবদের এমন নিষ্ঠাবান জ্ঞানী-গুণী নেতাও যখন ওসমানী তুর্কীদের বিরোধিতায় অবতীর্ণ হন, তখন সুবিচার আর ন্যায়নীতির সমস্ত দাবী ধূলিস্যাৎ হয়ে যায়। লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে, ধর্মের প্রতি তুর্কীদের কোন আগ্রহ নেই। এ কথা প্রমাণ করার জন্য লেখক ইতিহাসের উদ্ধৃতি দিয়ে উল্লেখ করেন যে, তুর্কী সুলতানরা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য ধর্মকে বিসর্জন দিয়ে এসেছেন (উম্মুল কোরা পৃষ্ঠা ১৬৪-৬৫ দ্রষ্টব্য)। বরং তিনি একথাও উল্লেখ করেন যে, সুলতান মুহম্মদ ফাতেহ স্পেনের খৃষ্টান শাসনকর্তা ফার্ডিনান্ড এবং ইজাবেলার সঙ্গে গোপনে এ চুক্তি করে রাখেন যে, সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ আন্দালুসিয়ায় বনু আহমরের সর্বশেষ আরব রাজত্ব খতম করার জন্য এ দু'জন খৃষ্টান শাসককে পুরোপুরি সুযোগ দেবেন। এ চুক্তি অনুযায়ী সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ আন্দালুসিয়ার ৫০ লক্ষ মুসলমানের হত্যাযজ্ঞ এবং তাদেরকে জোরপূর্বক খৃষ্টান বানানো মেনে নেন। মুসলমানদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে সুলতান আফ্রিকার রণপোতকে বাধা দেন। এর বিনিময়ে সুলতান সেই রণপোতের সাহায্যে প্রথমে মাকদুনিয়ায় এবং পরে কনস্টান্টিনোপলে হামলা করার এবং খৃষ্টানদের প্রাচ্য সাম্রাজ্যকে পরাজিত করার সুযোগ লাভ করেছেন। বিস্মিত হতে হয় এ জন্য যে, আবদুর রহমান কাওয়াকেবীর মতো আরব নেতাও অন্ধভাবে তুর্কীদের বিরুদ্ধাচরণে এতটা কঠোর হয়ে গেলেন যে, ঐতিহাসিক বাস্তবতার কথাও চিন্তা করলেন না। সুলতান মুহাম্মদ ফাতেহ ১৪৫৩ খৃষ্টাব্দে কনস্টান্টিনোপল অধিকার করেন। আর ফার্ডিনান্ড ও ইজাবেলা স্পেনের সিংহাসনে আরোহন করেন ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দে গিয়ে। ১৪৮১ খৃষ্টাব্দে সুলতান মুহম্মদ ফাতেহ মৃত্যুবরণ করেন। তখনও গ্রানাডায় ইসলামী রাজত্ব বহাল ছিল। আর ফার্ডিনান্ড ও ইজাবেলার হাতে স্পেনের পতন হয় ১৪৯২ খৃষ্টাব্দে। আন্দালুসিয়ায়

www.pathagar.com

মুসলমানদের হত্যাযজ্ঞ এবং জোরপূর্বক খৃষ্টানে পরিণত করার অভিযান শুরু হয় এরও কয়েক বৎসর পরে। আবদুর রহমান আল-কাওয়াকেবী তুর্কী সুলতানদের বিরুদ্ধে যেসব ভিত্তিহীন অভিযোগ উত্থাপন করে, আরব জাতীয়তাবাদীরা পরবর্তীকালে অশিক্ষিত জনগণকে বিভ্রান্ত করার জন্য সেসব অভিযোগের পুনরাবৃত্তি করে। আল-কাওয়াকেবী তুর্কীদের বিরুদ্ধে এ অভিযোগও উত্থাপন করেন যে, যখন স্পেনের খৃষ্টান শাসকরা আন্দালুসিয়ায় অবশিষ্ট মুসলমানদেরকে জীবন্ত পুড়িয়ে মারছিল, তখন ওসমানী শাসনকর্তা সুলতান সলীম মিশরে আব্বাসী শাসকদেরকে সমূলে উৎপাটিত করছিলেন আর এ যুলুম-নির্যাতনের সকল সীমা লংঘন করছিলেন। এমনকি সুলতান সলীম গর্ভবতী নারীদেরকে হত্যা করা থেকেও নিবৃত্ত হননি। সুলতান আবদুল হামীদ সম্পর্কে কাওয়াকেবী লিখেনঃ

সুলতান আব্দুল হামীদ মনে করতেন যে, সুদ আর মদ জায়েয করা এবং আল্লাহর সীমারেখা লংঘন করা হলে তাতে তার রাজত্ব সুদৃঢ় হবে। তুর্কী জাতি সম্পর্কে মত প্রকাশ করে তিনি লিখেন ঃ

"তুর্কীরা তাতারী মুসলমানদের বিরুদ্ধে রুশদেরকে সাহায্য করে এবং জাভা ও হিন্দুস্তানের বিরুদ্ধে হল্যান্ডকে সাহায্য করেছে।"

মোটকথা, আবদুর রহমান আল-কাওয়াকেবী ওসমানী খিলাফাতের বিরুদ্ধে আরবদেরকে উত্তেজিত করেন এবং তুর্কীদের নিকট থেকে স্বাধীনতা অর্জনের জন্য তীব্র ধারা অবলম্বন করেন। তাঁর রচিত গ্রন্থ উম্মুল কোরা থেকে উপরোক্ত তথ্য গ্রহণ করেছি। তাঁর এসব বক্তব্যের সারকথা এই যে, কেবল রাজনৈতিক কর্তৃত্ব তুর্কীদের হাতে থাকা উচিত আর তা-ও থাকবে নিছক বাধ্য হয়ে। তিনি চান যে, ধর্মীয় কর্তৃত্ব আরবদের হাতে ন্যস্ত করা হোক। আল-কাওয়াকেবীর এসব লেখা ধর্ম এবং রাজনীতি পৃথক করার দাবীকে অনেক সাহায্য-সহায়তা করেছে। সাম্রাজ্যবাদী চিন্তাধারায় তার দর্শনের বিরাট ছাপ পড়ে। মিঃ ব্লানট Future of Islam গ্রন্থে যেসব মত ব্যক্ত করেছেন, অমুসলিম শাসন, জিহাদ এবং খিলাফাত অধ্যায়ে তিনি সেসব মতেরই পুনরুক্তি করেছন মাত্র (পৃষ্ঠা ২৪-২৫)।

সিরীয় নেতারা মিশর থেকে যেসব গ্রন্থ প্রকাশ করেন, সেগুলোর মধ্যে উম্মুল কোরা ছাড়াও আরো একটা গ্রন্থ বিপুলভাবে বিক্রয় হয়েছে। তা হচ্ছে সুলায়মান বুস্তানী রচিত 'যিক্‌রা ওয়া ইব্‌রা।' খৃষ্টান লেখক এ গ্রন্থে ওসমানী সাম্রাজ্যের চুলচেরা বিশ্লেষণ করেন। ১৯০৮ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। এ গ্রন্থেও লেখক কল্প কাহিনীর সাহায্যে ওসমানী সাম্রাজ্য সম্পর্কে ভয়ংকর চিত্র অংকন করে। এতে যুলুম-নির্যাতনের এক বীভৎস চিত্র উপস্থাপন করা হয়। এরফলে মুক্তিকামী তুর্কী

www.pathagar.com

আর ইউরোপীয় জাতিসমূহ বেশ উপকৃত হয়, যারা তুর্কী সাম্রাজ্যকে বন্টন করার পরিকল্পনা আঁটছিল। নাসীম, ওলীউদ্দীন এবং হাফেজ ইবরাহীমের মতো কবি-সাহিত্যিকরা এসব বক্তব্যকে আরো রং চড়িয়ে উপস্থাপন করেন।

নারী স্বাধীনতার ফেৎনা

তৃতীয় আন্দোলন ছিল নারী স্বাধীনতার দাবীতে মুখর। এ আন্দোলনের দাবী ছিল নারীরা জীবনের সকল ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ করুক। পূর্বের দু'টি আন্দোলনের সঙ্গে এ আন্দোলনের গভীর সম্পর্ক ছিল। কারণ, পূর্ববর্তী দুটি আন্দোলন ছিল ব্যক্তি স্বাধীনতার দাবীদার। ব্যক্তি স্বাধীনতা কেবল পুরুষদের জন্যই প্রয়োজনীয় নয়, তাতে নারীদেরও অংশ থাকতে হবে। এ বিষয়ে পরপর কাসেম আমীনের দুটি গ্রন্থ প্রকাশ পায়। ১৮৯৯ সালে তাহরীরুল মারআত (নারী মুক্তি) এবং ১৯০০ সালে আল-মারআতুল জাদীদাহ (আধুনিকা নারী) প্রকাশিত হয়। সেকালে এ দু'টি গ্রন্থ বিরাট আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে তা নিয়ে বাদানুবাদ চলতে থাক। প্রথম গ্রন্থে লেখক প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, ইসলামের সঙ্গে পর্দার কোন সম্পর্ক নেই। ইসলাম নারীকে মুখ এবং হাত খোলা রাখার অনুমতি দিয়েছে। দ্বিতীয় গ্রন্থে রয়েছে আধুনিকতার পূর্ণ ছাপ। লেখক মিসরীয় নারীদেরকে ইংরেজ এবং ফরাসী নারীদের সমপর্যায়ে দেখতে চান।

এ গ্রন্থদ্বয় দ্বারা কাসেম আমীন মিশরীয় সমাজে কোন্ ধরণের চিন্তাধারা ছড়িয়েছেন, স্বতন্ত্রভাবে গ্রন্থদ্বয় অধ্যয়ন করে আমরা তা পর্যালোচনা করে দেখতে পারি।

তাহরীরুল মারআত গ্রন্থে লেখক ৪টি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছেন। প্রথম বিষয় হচ্ছে পর্দা। লেখক গ্রন্থের বেশীরভাগ পৃষ্ঠা ব্যয় করেন পর্দা সম্পর্কে আলোচনায়। দ্বিতীয় বিষয় জীবনের সকল ক্ষেত্রে নারীর অংশগ্রহণ। তৃতীয় বিষয় বহুবিবাহ। চতুর্থ বিষয় তালাক। এসব বিষয়ে লেখক যে মত প্রকাশ করেছেন, তা অবিকল পাশ্চাত্যের মতামতের প্রতিধ্বনী। অবশ্য লেখক যুলুম করেছেন এই যে, তিনি এসবকে ইসলামের অভিমত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন। পর্দা সম্পর্কে তিনি বলেন, ইসলামী শরীয়তে এমন কোন স্পষ্ট বিধান নেই, যাতে পর্দা করা প্রমাণ করা যায়। তাঁর মতে, একটা রেওয়াজ হিসাবে মুসলমানরা এ পর্দা প্রথা গ্রহণ করেছে। পরে এটাকেই দ্বীন বলে গ্রহণ করা হয়েছে। সমাজকে ফেতনা আর বিপর্যয় থেকে রক্ষা করতে হবে- যারা পর্দার পক্ষে এ যুক্তি দেন, তাদের জবাবে

www.pathagar.com

কাসেম আমীন বলেন, পুরুষদেরকে কেন বোর্কা পরানো হয় না? পুরুষের তুলনায় নারীর কি ইচ্ছা এবং আত্মসংযম শক্তি কম? বহুবিবাহ এবং তালাক সম্পর্কেও তিনি এ রকম উদ্ভট কথাবার্তা বলেছেন। এবং স্থানে স্থানে আলেম আর ফকীহদের সম্পর্কে কটাক্ষ করেছেন। এ গ্রন্থের প্রচুর বিরোধিতা করা হলেও তার জবাবে যা কিছু লেখা হয়েছে, তার বেশীরভাগই ছিল সংবাদপত্রের নিবন্ধ। অবশ্য মুহাম্মদ তালআত হারব তারবিয়াতুল মারআত ওয়াল হিজাব নামে একটা গ্রন্থ রচনা করেন, যা ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে মূল্যবান হলেও তা কাসেম আমীনের উত্থাপিত মৌলিক প্রশ্নের দাঁতভাঙ্গা জবাব ছিল না (ফরীদ বেজদী আফেন্দী আল-মারআতুল মুসলিমা তথা মুসলিম নারী নামে যে জবাব লিখেছেন, তা ছিল সবচেয়ে উত্তম জবাব। মনীষী মওলানা আযাদ গ্রন্থটি উর্দু তর্জমা করেন এবং তার বাংলা অনুবাদও প্রকাশিত হয়েছে পঞ্চাশের দশকেই- অনুবাদক)।

নারী যুক্তি প্রকাশ করার এক বৎসর পর লেখক অপর একটা গ্রন্থ বাজারে হাজির করেন। এটি হচ্ছে আল-মারআতুল জাদীদাহ। লেখক এ গ্রন্থে দ্বীন এবং শরীয়ত সম্পর্কে এমন সব মত ব্যক্ত করেছেন, যাতে ইসলামের সঙ্গে তাঁর কোন সম্পর্কই আর অবশিষ্ট থাকে না। এ গ্রন্থে তিনি সকল স্বীকৃত বিষয় এবং বিশ্বাস অস্বীকার করেন। অভিজ্ঞতা আর বাস্তবতার ভিত্তিতে তিনি আলোচনা করেছেন এবং এটাকে তিনি বলেছেন বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণ। এই বৈজ্ঞানিক যুক্তিপ্রমাণের আড়ালে লেখক নারীকে যথেচ্চাচারিতা, ধর্মীয় বন্ধন থেকে মুক্তি এবং সমাজের সকল ঐতিহ্য আর রীতিনীতির বিরুদ্ধে বিভ্রান্ত করা জন্য উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং প্রাণ খুলে পাশ্চাত্যের অনুকরণের জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, বর্তমান পারিবারিক বিধান এবং নারীর পর্দা প্রথা মেনে নেয়াই হচ্ছে মুসলমানদের পতন আর পশ্চাদপদতার মূল কারণ। কোন অমুসলিম ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে গ্রন্থ রচনা করতে চাইলে নিঃসন্দেহে এর চেয়ে ভাল গ্রন্থ রচনা করতে তিনি সক্ষম হবেন না।

ইসলামী মূল্যবোধ সম্পর্কে বিনয়ী ভূমিকা

মিশরে যে শ্রেণীটি পাশ্চাত্য সভ্যতা গ্রহণ করে দেশের উন্নতির জন্য সচেষ্ট ছিল, তাদের চিন্তাধারা আর কর্মকাণ্ড সম্পর্কে কিছুটা ধারণা দেয়া হলো ওপরে। এখন সে শ্রেণীটির চেষ্টা-সাধনা সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করুন, যাদের মতে ইসলামী ঐতিহ্যের অনুসরণে অর্জিত উন্নতিই হচ্ছে সত্যিকার উন্নতি। সত্যিকার অর্থে এটাই হচ্ছে পুনরুজ্জীবন। যে বিষয়টি এ শ্রেণীকে সবচেয়ে বেশী অস্থির ও

www.pathagar.com

চিন্তিত করে তুলেছিল, তা ছিল এই যে, যেসব মুসলিম নওজোয়ান পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতারণায় পড়েছে, তারা দ্বীনের সাথে সম্পর্ককে একটা গালী এবং ইসলামের বিধান মেনে চলায় লজ্জা বোধ করেন। এমনকি সে যুগের একজন সাহিত্যিক ডঃ ত্বা-হা হোসাইন ভাষা ও সাহিত্য বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে আল্লাহর নামে ভাষণ শুরু না করার জন্য ক্ষমা চেয়ে বলেন ঃ

আমি আল্লাহর নামে ভাষণ শুরু করলে শ্রোতৃমন্ডলী হয়তো এতে আমাকে উপহাস করবেন। কারণ, এটা আধুনিক স্টাইলের পরিপন্থী (দ্রষ্টব্য (আল-হিদায়াহ সাময়িকী, অক্টোবর-নভেম্বর সংখ্যা ১৯৬১)। এ শ্রেণীটি পাশ্চাত্যের উন্নতি-অগ্রগতির বিরোধী ছিল না; তবে তারা চাইতো যে, পাশ্চাত্য যে উন্নতি করেছে, ইসলামকে পরিত্যাগ না করেও সে উন্নতি অর্জন করা যায়। ইসলাম সম্পর্কে এ শ্রেণীর নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা ছিল সন্দেহ-সংশয়ের অতীত। অবশ্য এরা পাশ্চাত্যের সামনে বিনয়ীর ভঙ্গিতে কথা বলতো এবং এরা যে পাশ্চাত্যের ভয়ে ভীত, তাদের কথাবার্তা থেকেই তা প্রকাশ পেতো। তবে এরা পাশ্চাত্য সভ্যতার সয়লাবের মুখেও ইসলামের গুণকীর্তন করেছে এবং ইসলামের ইতিহাস-ঐতিহ্য লালন করার চেষ্টা করেছে। তাদের মধ্যে কিছু লোক মনে করতো যে, ইসলাম থেকে দূরে সরে যাওয়াই মুসলমানদের পশ্চাৎপদতার কারণ। কবি-সাহিত্যিকদের মধ্যে শাওকী ছিলেন এ ক্ষেত্রে অন্যদের চেয়ে অগ্রবর্তী। এ শ্রেণীর বুদ্ধিজীবীদের সম্মুখে আসল কাজ ছিল মানুষের মন থেকে ইসলামের ভুল ধারণা দূর করে সঠিক ধারণা বদ্ধমূল করা। সুতরাং ভুল আকীদা-বিশ্বাস দূরীভূত করার জন্যই সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহু, আবদুল্লাহ নাদীম, আব্দুর রহমান আল-কাওয়াকেবীসহ অন্যান্যরা এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। ১৮৮০ সালে প্রকাশিত আল-ওয়াকায়েউল মিসরিয়া গ্রন্থে শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহু মাশায়েখে তরীকত এবং মিলাদের বেদয়াত সম্পর্কে নিবন্ধ লেখেন। আব্দুল্লাহ নাদীম 'আল-ওস্তাদ' সাময়িকীর মাধ্যমে বেদয়াতের বিরুদ্ধে অভিযান চালান। আল-কাওয়াকেবী 'উম্মুল কোরা' গ্রন্থে চরমপন্থী সুফিয়াদের সম্পর্কে গরম গরম কথাবার্তা বলেছেন। এ সময় ধর্মের নামে মিশরে যেসব রসম রেওয়াজ চালু হয়, তাতে জাহেলী যুগের প্রতি শন পরিদৃষ্ট হয়। এমন পরিস্থিতিতে কাজ করা কোন সংস্কারকের পক্ষেই সহজ নয়।

শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর ব্যক্তিত্ব

সে যুগের সংস্কার প্রয়াসে শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর নাম সর্বাগ্রা গণ্য। এ কারণে

www.pathagar.com

আমরা তাঁর সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করতে চাই। তাঁর কর্মপ্রয়াসের সার কথা বলতে গেলে বলতে হয়, তিনি ইসলাম এবং পাশ্চাত্য সভ্যতার মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চালিয়েছেন। তিনি ছিলেন জামালুদ্দীন আফগানীর শিষ্য। এজন্য মুহাম্মদ আব্দুহুর আন্দোলনকে জামালুদ্দীন আফগানীর আন্দোলনের প্রতিফলন বলতে হয়।

মুহাম্মদ আব্দুহুর আন্দোলনকে আমরা দু'ভাগে বিভক্ত করতে পারি। এক ভাগ প্যারিসে নির্বাসনের পূর্বে এবং অন্যভাগ প্যারিসে নির্বাসন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করে তিনি যেসব কাজ করেছেন। এ দু'ধরনের কাজের মধ্যে বেশ পার্থক্যও দেখা যায়। প্রথম ধরনের কাজে দেখা যায়, তাঁর সমস্ত চেষ্টা-সাধনার কেন্দ্রবিন্দু হচ্ছে ইসলামী ঐক্য সাধন এবং সে ঐক্যকে শক্তিশালী করা। এ সময় তিনি জামালুদ্দীন আফগানীর সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং মুসলিম মিল্লাতের ঐক্য বিপন্ন দেখে মিল্লাতকে ঐক্যবদ্ধ করার জন্যই আন্দোলন পরিচালিত করেছেন। তাঁর আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায় প্রথম পর্যায় থেকে অস্বাভাবিক ভিন্ন দেখা যায়। এ পর্যায়ে পশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে ইসলামের ঐক্য স্থাপনের প্রয়াসে তাঁকে সচেষ্ট দেখা যায়।

প্রথম যুগে তিনি ছিলেন মুসলিম মিল্লাতের মধ্যে দেখা দেয়া সামাজিক এবং নৈতিক অবক্ষয়ের বিরুদ্ধে সংগ্রামমুখর। কোরআন এবং সুন্নার আলোকে মুসলমানদের ত্রুটি-বিচ্যুতি চিহ্নিত করে তিনি লিখেন যে, কিছু শব্দমালার নাম ইসলাম নয়। সময়ে সময়ে এ শব্দগুলো উচ্চারণ করলেই চলবে না। বরং ইসলাম এমন দৃঢ় বিশ্বাসের নাম, যা মুসলমানদের সমস্ত বিশ্বাস আর কর্মকে নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু নির্বাসন শেষে দেশে প্রত্যাবর্তন করার পর তাঁর চেষ্টা-সাধনায় ভিন্ন রং রূপ দেখা দেয়। একদিকে তিনি প্রবন্ধ নিবন্ধের মাধ্যমে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলন শুরু করেন, আবার অন্যদিকে কুরআন-হাদীসের ব্যাখ্যার মাধ্যমে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং ইসলামের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস করার কাজে তাঁকে নিয়োজিত হতে দেখা যায়। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান অন্তর্ভুক্ত করার আন্দোলন ছিল তাঁর প্রজ্ঞা, বিচক্ষণতা এবং দূরদর্শিতার পরিচায়ক। অপরদিকে তিনি আল-আযহারে দারস দান শুরু করেন। এসব দারস এবং সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিবন্ধে তিনি সাহসী ভূমিকা পালন করে স্বাধীন মতামত ব্যক্ত করেন। তাঁর এসব দারসে আল-আযহারের শিক্ষকবৃন্দ ছাড়াও আইনজীবী, বুদ্ধিজীবী এমনকি প্রশাসনের সঙ্গে যুক্ত ব্যক্তিবর্গও শরীক হতেন। শায়খ আহমদ ইব্‌রাহীম, হাফেজ ইব্‌রাহীম, মুহাম্মদ কুর্দ আলী, আহমদ ফাত্‌হী জগলুল, রফিক মুয়াজ্জাম, কাসেম আমীন এবং শায়খ আব্দুল আজীজ জাবিশ প্রমুখ ছিলেন তাঁর দারসের মধ্যমণি। এসব দারসে আর

www.pathagar.com

মাহফিলে তিনি যেসব মত ব্যক্ত করেন এবং যেসব ফতোয়া দান করেন, তাতে নিঃসন্দেহে লিবারেলিজম বা উদার নৈতিক মতবাদ পাওয়া যায়। এ কারণে তাঁর ব্যক্তিত্ব অদ্যাবধি বিতর্কিত রয়ে গেছে। আরব দেশের যেসব ব্যক্তি আধুনিকতা গ্রহণ করেছেন, তারা শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর ফতোয়াকে প্রমাণ হিসাবে পেশ করেন।

শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহু সম্পর্কে তাঁর জীবদ্দশায় এবং পরবর্তীকালে দু'ধরনের মতামত পাওয়া যায়। তাঁর শিষ্য মুহাম্মদ রশীদ রেজা এবং অন্যান্যরা তাঁকে মুজতাহিদের স্থান দান করেন এবং তাঁকে বড় দরের ইমাম বলে মনে করেন। অন্যদিকে তাঁর সমকালীন এবং পরবর্তীকালের কোন কোন মনীষী দ্বীন থেকে সরে দাঁড়াবার অভিযোগে তাঁকে অভিযুক্ত করেছেন। এরা বলেন যে, তিনি দ্বীনকে দ্বীনের দুশমনদের অভিপ্রায় অনুযায়ী পুনর্বিন্যাসের চেষ্টা চালিয়েছেন। এ দু'ধরনের লোক থেকে দূরে সরে গিয়ে বিচার করলেও দুটো বিষয় স্পষ্ট চোখে পড়ে। এক ঃ পাশ্চাত্যের রাজনীতিকদের গ্রন্থে শায়খ আব্দুহুর চিন্তাধারা আর সংস্কার আন্দোলনের প্রশংসা করা হয়েছে সর্বাধিক। এতে বলা হয় যে, তিনি পাশ্চাত্যের জন্য উল্লেখযোগ্য কাজ করেছেন। বিশেষ করে তিনি পাশ্চাত্য উপনিবেশ আর মুসলমানদের মধ্যে শত্রুতা হ্রাস করেছেন। এ শত্রুতা বহাল থাকলে মুসলমানদের মধ্যে পশ্চিমা উপনিবেশের বিরুদ্ধে বিক্ষোভ-বিদ্রোহ লেগে থাকতো, তা কখনো শেষ হতো না। এ প্রসঙ্গে নিম্নোক্ত গ্রন্থগুলো দ্রষ্টব্যঃ

Modern Egypt voll-2 P.129-182.
Whither Islam P.69. 163.171-172.
Great Britain in Egypt P. 165-176.
Islam in modern History p. 63-67.

الاتجاهات الحديثة في الاسلام (٦٤ . ٧٢ . ٨٤)

(ইসলামে আধুনিক ভাবধারা)

التاريخ السري لاحتلال انجلترا ا لمصر

(বৃটিশের মিসর অধিকারের গোপন ইতিহাস) গ্রন্থের ভূমিকা

زعماء الاصلاح في الازهر

(আল-আজ্‌হারের সংস্কারবাদী নেতা) গ্রন্থের পঞ্চম অধ্যায়।

অন্যদিকে দেখা যায়, শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহু ছিলেন ফ্রী মেসন এর সদস্য। ফ্রী মেসন-এর একজন গুরুত্বপূর্ণ সদস্য রচিত فضائح الماسونية

www.pathagar.com

গ্রন্থে উল্লেখ করা হয়েছে যে, জামালুদ্দীন আফগানী এবং তাঁর দলের লোকেরা লেবানন লজ-এ উপস্থিত হয়ে বক্তৃতা শুনতেন। লেবানন লজ-এ মার্কিন প্রতিনিধি আগমন করে মুহাম্মদ আব্দুহুকে অতি উচ্চমর্যাদায় আসীন করেন (পৃষ্ঠা ১২৪)।

১৯৬৩ সালে তেহরান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত দলীলেও এ কথা স্বীকার করা হয়েছে। শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর শিষ্য আল্লামা রশীদ রেজা তাঁর যে জীবনী গ্রন্থ রচনা করেছেন, তাতেও একথা স্বীকার করা হয়েছে (দ্রষ্টব্য তারীখুল ওস্তাদ আল-ইমাম, পৃষ্ঠা ৪০, ৪৬, ৪৮, ৮১৯ ও ৮৭৩ প্রথম খন্ড)। আমার মতে বৃটিশ ভারতে স্যার সৈয়দের যে স্থান ছিল, মিশরে শায়খ মুহাম্মদ আব্দুহুর ছিল সে স্থান। স্যার সৈয়দের সঙ্গে দ্বিমত পোষণ করা যায়, কিন্তু তাঁর নিষ্ঠা আর আন্তরিকতা অস্বীকার করা যায় না।

তুর্কী খেলাফতের অবসান

প্রথম মহাযুদ্ধ মিশরের অভ্যন্তরে ভীষণ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। ফলে নানা চিন্তাধারার আন্দোলন মিশরের সমাজ জীবনে নবপর্যায়ে তোলপাড় সৃষ্টি করে। জাতীয় পর্যায়ে সবচেয়ে বেশী তোলপাড় শুরু হয় ইসলামী খিলাফাত নিয়ে। ১৯১৪ সালের ১৮ই ডিসেম্বর ইংরেজরা মিশরের উপর নিজেদের কর্তৃত্ব ঘোষণা করে এবং তুরস্ক থেকে মিশরকে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন করার মানসে খেদিভ আব্বাসকে অপসারিত করে তদস্থলে হোসাইন কামেলকে সিংহাসনে বসায় এবং তাকে সুলতান উপাধী দান করে। তারা মিশরে তুর্কী প্রধান বিচারপতির পদও বিলুপ্ত করে, যা ছিল তুরস্ক এবং মিশরের মধ্যে সর্বশেষ সম্পর্ক। তুরস্কের ইসলামী খিলাফাত যাই কিছু থাকুক না কেন, এতসব কিছুর পরও মিশরীয় জাতি তুরস্কের সঙ্গে ছিল। এই পরিস্থিতিতে দেশে জরুরী আইন জারী করা হয়, সংবাদপত্রের উপর আরোপ করা হয় সেন্সরশীপ। জনগণ হোসাইন কামেলকে মেনে নিতে অস্বীকার করে। তাকে হত্যা করার জন্য দু'দফা হামলা চালানো হয়। ওয়াকফ দফতরের মন্ত্রীর উপরও হামলা চালানো হয় এবং প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের আলেমদের মুখ বন্ধ করা হয়। ১৯১৮ সালে মিশরের অভ্যন্তরে ইংরেজদের বেশ কিছু গোপন সংগঠন গড়ে উঠে। এরা সেনুসীদের সঙ্গে মিলে মিশর থেকে ইংরেজদেরকে বিতাড়িত করতে চায়। মুহাম্মদ ফরীদকে মনে করা হতো মোস্তফা কামেলের দক্ষিণ হস্ত। তাকে দেশ থেকে নির্বাসিত করা সত্ত্বেও তিনি ছিলেন ওসমানী খিলাফাতের সমর্থক। তুর্কী খিলাফাতের অবসানের

www.pathagar.com

জন্য ইংরেজরা মিশরে বেশ কিছু গুপ্ত সংগঠন গড়ে তোলে। তারা মিশরকেও যুদ্ধে টেনে আনে এবং যুদ্ধ কর নামে মিশরীয়দের উপর মোটা অংকের চাঁদা আরোপ করে। এর ফলে মিশরীরা ইংরেজদের বিরুদ্ধে উত্তেজনায় ফেটে পড়ে। অবশ্য দেশের একটা শ্রেণী ইংরেজদের সমর্থকও ছিল। মিশরের প্রধানমন্ত্রী ১৯১৫ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বরের এক ভাষণে বলেন, ইংরেজরা হচ্ছে সুবিচারক, আর জার্মানরা হচ্ছে যালেম। মিশরের একশ্রেণীর আলেম জনগণের উদ্দেশ্যে প্রকাশিত এক পত্রে শাসক শ্রেণীর আনুগত্য করার আবেদন জানান। এতসবের পরও সামগ্রিকভাবে গোটা জাতি ছিল তুরস্কের পক্ষে। মিশরের একজন খ্যাতনামা কবি মুহররম একটা কবিতায় বলেন ঃ

الترك جند الله لولا باسهم لم يبق في الدنيا مقيم اذان

- তুর্কীরা হচ্ছে আল্লাহর সৈনিক। তাদের প্রতাপ না থাকলে দুনিয়ায় আজান দেয়ার মতো কেউ থাকতো না।

দীর্ঘ চার বৎসর দেশে বিরাজ করে এক গভীর সঙ্কট। অবশেষে ১৯১৯ সালে মুস্তফা কামেলের নেতৃত্বে ইংরেজ এবং ইংরেজদের ক্রীড়নক সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু হয়। বিদ্রোহ দমন করার জন্য ইংরেজদের ক্রীড়নক সরকার অকথ্য নির্যাতন চালায়। মিত্রবাহিনী তুরস্ক অধিকার করে নিলে মিশরে শোকের ছায়া নেমে আসে। এ সময় হাফেজ ইবরাহীমের একটা কবিতা ছিল সকলের মুখে মুখেঃ

ايا صوفيا حان التفرق فاذكري عهود كرام فيك صلوا وسلموا

- আবা সুফিয়া! বিচ্ছেদের সময় ঘনিয়ে এসেছে। কিন্তু তোমাকে সেসব মহান ব্যক্তিদের যুগের কথা স্মরণ করতে হবে, যারা তোমার মধ্যে নামায আদায় করেছিলেন।

এহেন দুঃখজনক পরিস্থিতিতে মুস্তফা কামাল পাশার নেতৃত্বে তুর্কীরা আজাদী আন্দোলন শুরু করলে মিশরীরা উৎফুল্ল হয়ে উঠে। তখন গাজী মুস্তফা কামাল পাশার উপর তাদের দৃষ্টি কেন্দ্রীভূত হয়। তিনি দেশের কিছু অংশ থেকে গ্রীক সৈন্য অপসারণ করতে সক্ষম হলে কবি শাওকী একটা কবিতায় বলেন ঃ

الله اكبركم في الفتح من عجب ياخالد الترك جدد خالد العرب

- আল্লাহ আকবার। এ বিজয় কতইনা বিস্ময়কর। হে তুর্কী খালেদ, আরবের খালেদের স্মৃতি জাগরিত কর।

www.pathagar.com

মুস্তফা কামাল তুরস্কের আস্তানা শহর মুক্ত করলে মিশরীয়দের উল্লাসের সীমা থাকে না। মুস্তফা কামাল খলীফা ওহীদুদ্দীনকে অপসারণ করে তদস্থলে আবদুল মজিদ খানকে খিলাফাতের আসনে বসান। মিশরবাসী এ পদক্ষেপকেও অভিনন্দিত করে। অবশ্য মুস্তফা কামাল পরে ধর্ম ও রাষ্ট্র পৃথক করার ঘোষণা দিয়ে সুলতান আবদুল মজীদ খানের রাজনৈতিক ক্ষমতা খর্ব করলে সুলতান কেবল নামেমাত্র খলীফা থেকে যান। এটা ছিল এক ভয়ঙ্কর পদক্ষেপ। কিন্তু মিশরের এক শ্রেণীর বুদ্ধিজীবী এ পদক্ষেপের প্রতিও অভিনন্দন জ্ঞাপন করে। অবশ্য মুস্তফা কামাল নামকাওয়াস্তের খিলাফাতেরও অবসান ঘটালে মিশরীরা যারপরনাই দুঃখিত হয়। এ সময় রচিত একটা কবিতায় শাওকী লিখেন ঃ

عادت اغاني ا لعرس رجع نواح ونعيت بين معالم الافراح

- বিয়ের শোক গাথায় পরিবর্তিত হয়েছে। হে খিলাফাত! আনন্দের আসরে পঠিত হচ্ছে তোমার শোকগাঁথা।

খিলাফাতের নতুন দাবীদার

খিলাফাত বিলোপের চার দিন পর আল-আযহারের আলেম সমাজের পক্ষ থেকে প্রকাশিত বিবৃতিতে মুস্তফা কামালের এ পদক্ষেপকে নাজায়েয বলে আখ্যায়িত করা হয় এবং ইসলামী খিলাফাত বহাল করার নিমিত্ত জরুরী ভিত্তিতে একটা সম্মেলন আহ্বানের প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়া হয়। এ বিবৃতির পর নানা মহল থেকে খিলাফাতের দাবীদার দেখা দেয়। আফগানিস্তানের বাদশাহ আমানুল্লাহ খলীফাতুল মুসলিমীন হওয়ার আগ্রহ প্রকাশ করেন। শরীফ হোসাইন ইবনে আলীতো ফিলিস্তিন আর পূর্ব জর্দানের জনগণের নিকট থেকে খিলাফাতের বয়াতই গ্রহণ করেছেন। খলীফা হতে আগ্রহী ব্যক্তিদের মধ্যে মিশরের বাদশাহ ফুয়াদও ছিলেন। ওদিকে ইংরেজরা চেষ্টা করছিল কোনভাবেই যাতে খিলাফাত পুণর্বহাল হতে না পারে। পদচ্যুত খলীফা ওহীদুদ্দীন মালটায় নির্বাসিতের জীবন যাপন করছিলেন। তিনিও সেখান থেকে একটা বিবৃতি জারী করে খিলাফাতের দাবী তুলে বলেন যে, তিনি তুরস্কের আস্তানা থেকে পলায়ন করেননি, বরং কামাল গ্রুপের ইসলাম বিদ্বেষের কারণে তিনি হিজরত করেছেন। মোটকথা, একদিকে ইসলামী সম্মেলন অনুষ্ঠানের দাবী জোরদার হয়ে উঠছিল, অন্যদিকে খিলাফাতের দাবীদাররা তাদের দাবী জোরদার করে তুলছিলেন। শেষ পর্যন্ত ইসলামী সম্মেলনের নামে একটা কমিটি গঠিত হয় এবং একটা সাময়িক পত্রিকাও প্রকাশ

www.pathagar.com

করা হয়। পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় সৈয়দ রশীদ রেজার একটা নিবন্ধও প্রকাশ করা হয়। এ নিবন্ধে তিনি লিখেন যে, এটা হচ্ছে প্রথম ইসলামী সম্মেলন, যাতে সকল দেশের আলেমরা অংশগ্রহণ করতে যাচ্ছেন। এ সম্মেলনে মুসলমানদের একজন খলীফা এবং ইমাম নির্বাচিত করা হবে। মিশরের স্থানে স্থানে ইসলামী সম্মেলনের শাখা খোলা হয়। মুসলমানদের মধ্যে দেখা দেয় নয়া উদ্দীপনা। এ সম্মেলন কয়েকবার মুলতবী হয়ে যায়। কেননা, সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ার বেশ কিছু কারণ দেখা দেয়। এর সবচেয়ে বড় বাহ্যিক কারণ ছিল এই যে, সা'আদ জগলুল নীতিগতভাবে ইসলামী ঐক্যের বিরোধী ছিলেন। তখন তিনি মিশরের প্রধানমন্ত্রী আর মিশরের জনসাধারণের উপর তাঁর ছিল বিরাট প্রভাব। এ সময় জনগণের মধ্যে গুজব ছড়িয়ে পড়ে যে, ইংরেজরা বাদশা ফুয়াদকে খলীফা বানাবার চেষ্টা চালাচ্ছে। তাই সর্বপ্রথম আল-আযহারের পক্ষ থেকে বাদশাহ ফুয়াদের বিরোধিতা শুরু করা হয় এবং বুদ্ধিজীবীরা দু'শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এক শ্রেণী সরকারী প্রতিনিধিত্ব করছিল এবং আল-আযহারের রেক্টর ছিলেন এ শ্রেণীর নেতা। বাদশাহ ফুয়াদের দিকে এদের ঝোঁক ছিল। অপর শ্রেণীর নেতৃত্বে ছিলেন শায়খ মুহাম্মদ মাজী। এরা শাহ ফুয়াদের খিলাফাতের দাবীর বিরোধিতা করে বলে যে, মিশর খিলাফাতের পূণ্যভূমি হতে পারে না। এদের মতে খিলাফাত সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত স্থান হচ্ছে মক্কা।

বারবার মুলতবী করার পর অবশেষে ১৯২৬ সালের ১২ই মে অনুষ্ঠিত হয় এ সম্মেলন। এতে সর্বসাকুল্যে ৩৪ জন প্রতিনিধি যোগদান করেন এবং আলাপ-আলোচনা ছাড়া আর কোন ফল দেখা দেয়নি। অবশেষে নিষ্প্রাণ প্রস্তাব গ্রহণের মধ্য দিয়ে সম্মেলনের সমাপ্তি ঘটে। প্রস্তাবে বলা হয় যে, খিলাফাত কনফারেন্সের নির্বাহী কমিটির সদর দফতর থাকবে মিশরে। অন্যান্য মুসলিম দেশে শাখা স্থাপন করা হবে এবং প্রয়োজন অনুযায়ী সম্মেলন ডাকা হবে। খিলাফাত বিলুপ্ত করার পর তা পুনরায় চালু করার জন্য যেসব চেষ্টা-সাধনা চালানো হয়, এটা হচ্ছে তার দুঃখজনক পরিণতি। খিলাফাতের বিলুপ্তির মতো খিলাফাত সম্মেলনের ব্যর্থতাও ছিল মিশরের জনগণের জন্য একটা দুঃখজনক ঘটনা।

ইসলামের দুশমনদের আনন্দ-উল্লাস

খিলাফাতের অবসান আর খিলাফাত কনফারেন্সের ব্যর্থতায় মিশরের পাশ্চাত্যঘেঁষা গোষ্ঠী যারপরনাই উল্লসিত হয়। এ দু'টি ঘটনার ফলে মিশরের মুসলমানরা কেবল রাজনৈতিক অস্থিরতার শিকারেই পরিণত হয়নি, বরং নৈতিক

www.pathagar.com

দেউলিয়াপনা আর ধর্মবিরোধী এক ভয়ঙ্কর আন্দোলনও শুরু হয়ে যায়। এ সময় ইসলামের খিলাফাত এবং রাজনৈতিক দর্শন বিষয়ে চারটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ রচিত হয়। এসব গ্রন্থ বেশ কয়েক বৎসর ধরে জাতিকে দার্শনিক তত্ত্ব নিয়ে আলোচনায় প্রবৃত্ত রাখে। এরমধ্যে দু'টি গ্রন্থে ইসলামের খিলাফাত দর্শন সম্পর্কে সঠিক চিত্র উপস্থাপন করা হয়। অপর দুটি গ্রন্থ ছিল ইসলামের খিলাফাত দর্শনের বিপরীত। যে দু'টি গ্রন্থে খিলাফাতের সঠিক চিত্র পেশ করা হয়, তার একটি হচ্ছে সৈয়দ রশীদ রেজা রচিত আল-খিলাফাত আও আল ইমামাতুল উযমা (খিলাফাত বা বড় ইমামত) অপর গ্রন্থটি হচ্ছে তুরস্কের সাবেক শায়খুল ইসলাম মুস্তফা ছাবরী রচিত- النكير علي منكري النعمة من الدين والخلافة والامة

(দ্বীন, খিলাফত এবং উম্মতের বিরুদ্ধবাদীদের মুন্ডপাত)। এ দুটি গ্রন্থে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে এবং গবেষণা আর পান্ডিত্যপূর্ণ ভঙ্গিতে শরীয়তের বৈশিষ্ট্য ও খিলাফতের ভিত্তি নিয়ে আলোচনা করা হয়। মুস্তফা ছাবরী নিতান্ত খোলাখুলিভাবে মোস্তফা কামালের দর্শন পর্যালোচনা করে প্রমাণ করছেন যে, ইংরেজ আর ইহুদীদের যোগসাজশে তিনি ইসলামী খিলাফাত রহিত করেছেন। অপর দু'টি গ্রন্থের একটি ছিল আল-খিলাফাত ওয়া সালতাতুল উম্মাত (খিলাফাত ও উম্মাতের ক্ষমতা)। সৈয়দ রশীদ রেজার গ্রন্থটির পরে এ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। মূলতঃ গ্রন্থটি রচিত হয় তুর্কী ভাষায়, পরে এর আরবী সংস্করণ প্রকাশ করা হয়। এ গ্রন্থের রচয়িতা অজ্ঞাত। তার নাম বলা হয় আবদুল গনী সুন্নী। গ্রন্থটি সম্পর্কে এ কথা প্রকাশ পায় যে, মোস্তফা কামালের সমর্থকদের ইঙ্গিতে তুর্কীদের একটা কমিটির তত্ত্বাবধানে এটা রচিত হয়েছে। তুর্কী সরকার রাষ্ট্রীয় অর্থে বইটি প্রকাশ এবং প্রচার করেছে। গ্রন্থে ফিকহের দৃষ্টিকোণ থেকে এটা প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, খিলাফাত একটা রাজনৈতিক বিরোধ, এর সঙ্গে ধর্মের কোন সম্পর্ক নেই। শিয়া আর খারেজীরা কূটতর্কের দ্বারা এটাকে ধর্মীয় আলোচ্য বিষয়ে পরিণত করেছে। এ ধরনের আরেকটি গ্রন্থ হচ্ছে আলী আবদুর রাজ্জাক প্রণীত আল-ইসলাম ওয়া উসূলুল হুকম্ (ইসলাম ও শাসন নীতি)। এটি ছিল এ পর্যায়ে রচিত সর্বশেষ গ্রন্থ। মিশরের বুদ্ধিজীবী মহলে এ গ্রন্থ সবচেয়ে বেশী প্রভাব বিস্তার করে। এ গ্রন্থে প্রাচ্যবিদদের রীতি অবলম্বিত হয়েছে এবং ইতিহাস বা ফিক্হ্-এর উদ্ধৃতি কিতাব ও সুন্নাহ থেকে গ্রহণ না করে বেশীরভাগ গ্রহণ করা হয়েছে প্রাচ্যবিদদের গ্রন্থ থেকে। কোন রকম রাখঢাক না করেই ইসলাম এবং মুসলমানদের উপর হামলা চালানো হয়েছে এবং স্থানে স্থানে মুসলিম দৃষ্টিভঙ্গিকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে। এ গ্রন্থের রচয়িতা আলী আবদুর রাজ্জাক এমন এক

www.pathagar.com

পরিবারের সদস্য, যে পরিবারের অধিকাংশ লোক ছিল মিশরের দস্তুর পার্টির সদস্য। রাজমহলের সমর্থক দল হিয্‌বুল ইত্তিহাদ-এর সঙ্গে মিলে এ দলটি সরকারও গঠন করে। আলী আবদুর রাজ্জাক পড়ালেখা করেন আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে। কিন্তু তার এ গ্রন্থ প্রকাশের পর আল-আযহারের সুপ্রীম কাউন্সিল ওলামায়ে আযহারের তালিকা থেকে তার নাম খারিজ করে দেয়। ফলে তাকে কাযীর পদও হারাতে হয়। তখন মিশরের আইনমন্ত্রী ছিলেন আব্দুল আজীজ ফাজলী। ইনি ছিলেন দস্তুর পার্টির সদস্য। তাই তিনি সুপ্রীম কাউন্সিলের সিদ্ধান্ত কার্যকর করতে অস্বীকার করেন। ফলে বাদশাহ ফুয়াদ তাকে পদচ্যুত করেন। তাকে পদচ্যুত করার প্রতিবাদে দস্তুর পার্টির সকল মন্ত্রী পদত্যাগ করেন। ফলে গ্রন্থটি কেবল বুদ্ধিজীবী মহলেই তোলপাড় সৃষ্টি করেনি, বরং তা রাজনৈতিক বিরোধও সৃষ্টি করে। এ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে খিলাফাত দর্শনের ভিত চুরমার করে বলা হয় যে, মুসলমানদেরকে খিলাফাত প্রতিষ্ঠা করতে হবে, কোরআন আর সুন্নায় এমন কোন প্রমাণ নেই। যেসব ফিক্‌হবিদরা কুরআন আর সুন্নাহ থেকে খিলাফাত প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন, তারা মনগড়া কথা বলেছেন। দ্বিতীয় অধ্যায়ে ইসলামের শাসন নীতির ভিত চুরমার করা হয়েছে। এতে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হয়েছে যে, নবীজী কেবল রিসালাতের দায়িত্ব পালন করেছেন। বাদশাহী বা শাসন-কর্তৃত্বের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। তৃতীয় অধ্যায়ে তিনি ইসলামের দিওয়ানী, ফৌজদারীসহ সমস্ত আইন অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, কোন মানুষ রাসূলে খোদার স্থলাভিষিক্ত হতে পারে না। খোলাফায়ে রাশেদীনের নেতৃত্ব ছিল ধর্মহীন (নাউযুবিল্লাহ)। মোট কথা, এ গ্রন্থ কেবল ইসলামের ইতিহাসকেই বিকৃত করেনি, বরং ইসলামের গোটা জীবন ব্যবস্থার ধারণাই বদলে ফেলার চেষ্টা করা হয়েছে এবং একটা মিল্লাত হিসাবে মুসলমানদের অস্তিত্বই অস্বীকার করা হয়েছে। এসব ভ্রান্ত চিন্তা মুসলমানদের সবচেয়ে বেশী ক্ষতি সাধন করে এবং ইসলাম সম্পর্কে মুসলমানদেরকে বীতশ্রদ্ধ করে তুলতে বিরাট সহায়কের ভূমিকা পালন করে। ফলে দেশের অভ্যন্তরে নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা মাথাচাড়া দিয়ে উঠে।

তুরস্কের নাস্তিক্যবাদীরা আইন আর ক্ষমতার জোরে মুসলমানদের উপর সেকুলারিজম চাপিয়ে দেয়, কিন্তু মিশরে স্বেচ্ছায় সেকুলারিজম বরণ করে নেয়ার আকারে তার প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। তুরস্কে কামালপন্থীরা শ্বেত ভল্লুককে দলীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করে, আর মিশরে জাতীয় প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয় আবুল হাওলকে এবং কারেন্সি নোট আর ডাক টিকেটে তা মুদ্রিত হয়। তুরস্কের অনুকরণে মিশরের অভ্যন্তরেও শরীয়তী আদালতের অবসান ঘটানো হয়।

www.pathagar.com

পর্দাহীনতা আর নারী পুরুষের অবাধ মেলামেশার সুযোগের দাবী উঠে জোরেশোরে। আরবী বর্ণমালার বদলে ল্যাটিন বর্ণমালা চালু করার আন্দোলনও গড়ে ওঠে।

আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগান

ওদিকে আরব জাতীয়তাবাদ পুনরায় মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। মহাযুদ্ধের পূর্বে ইসলামী ঐক্যের দাবীর মুখে আরব জাতীয়তাবাদের শ্লোগানের জনপ্রিয়তা কিছুটা হ্রাস পায়। কিন্তু খিলাফাতের অবসানে আরব জাতীয়তাই ঐক্যের বাহন হয়ে দেখা দেয় এবং পূর্বের তুলনায় উন্নত পরিবেশও লাভ করে। কিছু লোক আরব জাতীয়তাকে ঐক্য ও সংহতির প্রতীক জ্ঞান করতো এবং তারা এটাকে ইসলামী ঐক্যের পরিপন্থী মনে করতো না। অবশ্য মিশরে বসবাসরত লেবাননী খৃষ্টানরা আরব জাতীয়তাকে একটা দর্শন হিসেবে উপস্থাপন করে। মিশরের আধুনিকতাবাদী পাশ্চাত্যপন্থীরা এদের প্রতি ঝুঁকে পড়ে। পরবর্তীকালে আরব জাতীয়তা আরো কতিপয় আনুষাঙ্গিক জাতীয়তার জন্ম দেয়- অশূরী জাতীয়তা, বাবেলী জাতীয়তা, কালদানী জাতীয়তা, হিত্তি জাতীয়তা, ফেরাউনী জাতীয়তা ইত্যাদি। শেষোক্ত জাতীয়তার সম্পর্ক ছিল মিশরের মাটির সঙ্গে।

১৯১৯ সালে সা'আদ জগলুলের নেতৃত্বে সাম্রাজ্যবাদ আর উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে শুরু হয় উত্তাল আন্দোলন। এ আন্দোলনের ফলে মিশরের জনগণের উপর সাম্রাজ্যবাদীরা যে নির্যাতন চালায়, তার ফলে মানসিক দূরত্ব সত্ত্বেও গোটা জাতি ঐক্যবদ্ধ হয়। দ্বন্দ্বমুখর সকল দল আর মতের লোকেরা একজোট হয়ে কাজ করতে এগিয়ে আসে। আয্হারী ওলামা আর উম্মাহ পার্টির নাস্তিকরা এক মঞ্চে দাঁড়িয়ে উপনিবেশবাদের বিরুদ্ধে বুক পেতে দেয়। কিন্তু এই ঐক্য ছিল সাময়িক। সন্ত্রাসী মহল এ ঐক্যকে ব্যবহার করে মিশরীয় জাতীয়তা চাঙ্গা করার একটা মাধ্যম হিসাবে আর মিশরীয় জাতীয়তার যোগসূত্র ছিল ফেরাউনী জাতীয়তার সঙ্গে। ফলে একদিকে মিশর জাতি ব্যর্থ বিদ্রোহের দণ্ড ভোগ করছিল আর অপরদিকে ফেরাউনী জাতীয়তার শ্লোগান সাধুবেশে নিজের জন্য পথ পরিস্কার করে নিচ্ছিলো। ইহুদী, খৃষ্টান আর সাম্রাজ্যবাদের এজেন্টরা তলেতলে এ আন্দোলনে ইন্ধন যোগায় এবং বড় বড় রাজনীতিকরাও ফেরাউনী জাতিসত্ত্বার পতাকাবাহী হয়ে দাঁড়ায়। আর এসব কিছুই চলছিল মিশরের ঐক্যের নামে। মিশরের খ্যাতনামা লেখক মুহাম্মদ মুহাম্মদ হোসাইন এ প্রসঙ্গে 'আধুনিক সাহিত্যে জাতীয়তাবাদী ধারা' গ্রন্থে লিখেন ঃ

মিশরে জাতীয়তাবাদের ধূয়া উঠে এবং তা প্রায় সমস্ত সাংস্কৃতিক অঙ্গন ছেয়ে

www.pathagar.com

যায়। ফেরাউনী বুনিয়াদের উপর শিল্প-সাহিত্য গড়ে তোলার ডাক আসে। সাপ্তাহিক সিয়াসাত (রাজনীতি) ছিল এই নতুন দৃষ্টিভঙ্গির মুখপত্র। ফেরাউনবাদের প্রবক্তাদের জন্য এর পাতা ছিল উৎসর্গ। এর কোন সংখ্যা এমন ছিল না, যাতে ফেরাউনী সভ্যতা-সংস্কৃতি এবং শৌর্য-বীর্যের গান গাওয়া হতো না। পত্রিকাটির সম্পাদক একবার লিখেন, এটা বাস্তব কথা যে, আমাদের পূর্বসূরী ফেরাউনদের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক এখনো অটুট রয়েছে।

ফেরাউনবাদের প্রতি আহ্বান আগে মুখোশ পরে সামনে আসতো আর এখন তা খোলাখুলি মাথা তুলছে। ফেরাউনবাদের দাবীদারদের জন্য এটা ছিল সুবর্ণ সুযোগ। মানুষের চিন্তাধারায় ফেরাউনী ছাপ মুদ্রিত করার জন্য তারা তৎপর হয়ে উঠছে। সংবাদপত্রের পাঠক আর আসরের শ্রোতাদের সম্মুখে ফেরাউনবাদ ছাড়া অন্য কোন চিত্র আসে না। ফেরাউনবাদের প্রতীক হিসাবে আবুল হাওল (ফেরাউনী যুগের একটা মূর্তির) চিত্র কারেন্সী নোট এবং ডাক টিকিটের উপর মুদ্রিত হয়। বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনস্থ প্রতিটি কলেজ নিজেদের জন্য ফেরাউন যুগের কোন একটি মূর্তিকে নিজেদের প্রতীক হিসাবে মনোনয়ন করে নিয়েছে। মৃত্যুর তিন বৎসর পর সা'আদ জগলুলের মৃতদেহকে নতুন কবরে স্থানান্তর করা হয়, যা খোদাই করা হয় ফেরাউনী রীতিতে। অধিকাংশ সরকারী ইমারতেও গৃহীত হয় ফেরাউনী রীতি। সরকারী দফতরে ঝুলানো ছিল ফেরাউনী প্রতিকৃতি। হাফেজ ইবরাহীমের মতো একজন নামকরা কবিও ১৯২১ সালে একজন জাতীয়তাবাদী নেতার সম্মানে রচিত কবিতায় ফেরাউনবাদের প্রতি ভালোবাসা ব্যক্ত করেন (২য় খন্ড, পৃষ্ঠা ১৪৬-৪৭)।

প্রাচীন আর আধুনিকের সংঘাত

প্রথম মহাযুদ্ধের পর চিন্তাধারার ক্ষেত্রে যে সর্বগ্রাসী তাণ্ডব দেখা দেয়, সে সম্পর্কে আমরা কিছুটা আলোচনা করেছি। কিন্তু অপর একটা মানসিক দ্বন্দ্ব সম্পর্কে আলোচনা না করলে এ আলোচনা সম্পূর্ণ হবে না। তখন এ মানসিক দ্বন্দ্বের নাম দেয়া হয়েছিল প্রাচীন আর আধুনিকের সংঘাত। মূলত এটা ছিল নাস্তিক্যবাদ আর নৈতিক দেউলিয়াপনার পতাকাবাহী। সামাজিক ঐতিহ্যের বন্ধন ছিন্ন করে একটা লাগামহীন এবং নির্লজ্জ জাতি গড়ে তোলাই ছিল এর লক্ষ্য। কিন্তু আসল লক্ষ্য উহ্য রাখার জন্য তাকে বলা হয়েছে প্রাচীন আর আধুনিকের সংঘাত এবং ইতিহাসের দাবীর মোড়কে তাকে পেশ করা হয়েছে। প্রাচীন আর আধুনিকের বিষয়টা ছিল অনেক পুরাতন; কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর তা এমনই

www.pathagar.com

তীব্র হয়ে দেখা দেয় যে, সাংবাদিকতা থেকে শুরু করে সাধারণ বৈঠক পর্যন্ত সবকিছুই এর করাল গ্রাসে পতিত হয়। মুসলমানদের দ্বীন, ঐতিহ্য আর চিন্তাধারার সঙ্গে সম্পৃক্ত সব কিছুকেই প্রাচীন বলে বুঝানো হতো, আর ইউরোপ থেকে মিশরে যা কিছু আমদানী করা হচ্ছিলো, তাকেই বলা হতো আধুনিক। মূলতঃ মোহাম্মদ আলী পাশার শাসনামল থেকেই এ সংঘাত শুরু হয়। মিশরের ঐতিহ্যবাদী বা বদ্ধ সমাজ থেকে বের হয়ে যেসব শিল্প মিশন ইউরোপ গমন করে বা ইউরোপ থেকে যেসব বিশেষজ্ঞ মিশরে আগমন করে, তারাই এ সংঘাতের বীজ বপন করছিল। ইসমাঈল পাশার শাসনামলে এ সংঘাত চরম রূপ লাভ করে। কারণ, ইসমাইল পাশা চাইতেন মিশরকে ইউরোপের একটা অংশে পরিণত করতে। এ কারণে ইউরোপের যে কোন কিছুর জন্য তিনি উদারভাবে মিশরের দরজা উন্মুক্ত করে দিতেন। মুফতী আব্দুহু এবং শায়খ আব্দুল্লাহ নাদীম এর বিরোধিতা করেছেন। কিন্তু তাঁরা নিজেরাও ছিলেন ইউরোপ দ্বারা প্রভাবিত এবং ইউরোপের ভয়ে ভীত। এ কারণে তাঁরা সাধারণত ইসলামের প্রতিরোধ করতে গিয়ে বিনয়ীর ভূমিকা পালন করতেন, বা প্রাচীন এবং আধুনিকের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধানের চেষ্টা চালাতেন। মহাযুদ্ধের পর এ সংঘাত আদর্শিক যুদ্ধের রূপ গ্রহণ করে। মিশরের নামকরা লেখক মোহাম্মদ মোহাম্মদ হোসাইনের মতে যুদ্ধকালে মিশরে যে নৈতিক অবক্ষয় দেখা দেয়, এ সংঘাত তীব্রতর করার ক্ষেত্রে তারও ভূমিকা ছিল। তিনি বলেন ঃ

মহাযুদ্ধ চলাকালে মিশরে বিপুল সংখ্যায় নানা জাতির লোকের আগমন ঘটে। এরা মিশরের অলি-গলিতেও ছড়িয়ে পড়ে এবং দিবা-রাত্র এরা মদ আর জুয়ার আড্ডা খুঁজে বেড়ায়। গোপন আর প্রকাশ্য এবং লাইসেন্সপ্রাপ্ত আর লাইসেন্সবিহীন গণিকালয় ছিল এদের মৌজ করার স্থান। যুদ্ধের গোটা চার বৎসর মানুষ তাদের এ দেউলিয়াপনা প্রত্যক্ষ করে। এ সময় হত্যা, লুটতরাজ আর সন্ত্রমহানীর প্রচুর ঘটনা ঘটে। সুযোগ সন্ধানী নীচ শ্রেণীর লোকেরা এ পরিস্থিতিকে বেশ কাজে লাগায়। ফলে দায়ুসী আর দালালী বেশ বেড়ে যায়। চিত্ত বিনোদন আর মদ-জুয়ার কেন্দ্র বিপুল পরিমাণে গড়ে উঠে।

বিনোদন কেন্দ্র মিশরীয় সমাজে যে ধ্বংসযজ্ঞ ডেকে এনেছে, তার চিত্র অংকন করেছেন স্বনামধন্য মিশরীয় সাহিত্যিক মোস্তফা লুত্ফী মানফালূতী। নৃত্যশালা শিরোনামে এক নিবন্ধে তিনি লিখেন ঃ

আমি নৃত্যশালায় টাকা উজাড় করতে দেখেছি। মানুষের জ্ঞান-বুদ্ধি লোপ পাচ্ছে আর পকেট কাটার জাল পাতা হচ্ছে। মন কাবু করার জন্য ফাঁদ পাতা

www.pathagar.com

হয়েছে। যে লোকটাকে আমি সবচেয়ে বেশী বুদ্ধিমান মনে করতাম, যাকে আমি মনে করতাম সবচেয়ে বড় বিবেকবান এবং যার সম্মুখে আমি শ্রদ্ধায় অবনত হতাম, তাকে আমি দেখতে পেয়েছি এক সুন্দরী ললনার জালে আবদ্ধ হতে। সুন্দরী তাকে নাচাচ্ছে। তাকে উপরে তুলছে, আর নীচে নামাচ্ছে, খেলনায় পরিণত করে তার সঙ্গে খেলা করছে। অথচঃ এ ব্যক্তি যখন জনগণের কাছে যায়, তখন মানসম্মানে সে রোম সম্রাট কাইজার, আর গর্ব-অহংকারে সে ইরানের বাদশাহ কিসরা!

এসব বিনোদন কেন্দ্র আর নৃত্যশালা মিশরীয় জাতির ইসলামী ঐতিহ্য আর মূল্যবান মূল্যবোধকে মারাত্মকভাবে আহত করে। গুন্ডা আর লম্পট শ্রেণীর জোর এমনই বৃদ্ধি পায় যে, তারা প্রকাশ্যে লজ্জা-শরমের মুন্ডপাত করে। এসব ব্যাপারে সাধারণ মানুষ ছিল অনুভূতিহীন। যেসব হাজার হাজার কৃষক মিত্র বাহিনীর সৈন্যদের সেবা করার জন্য গ্রাম থেকে শহরে আগমন করেছিল, যুদ্ধ শেষে তারা গ্রামে ফিরে দেখে যে, সেখানেও মূল্যবোধের দারুণ অবক্ষয় ঘটেছে। যৌন ব্যাধি আর বিকৃত চরিত্র সঙ্গে নিয়ে তারা নিজেরাও গৃহে ফিরে যায়। যারা শহরে থেকে যায়, তারা ডুবে যায় নৈতিক অবক্ষয়ে। এভাবে গণমানুষের দ্বীনী চেতনা আর ইসলামী মূল্যবোধের মর্যাদাও হয়ে পড়ে ভুলুণ্ঠিত। আর যেহেতু ইসলামী ফ্রন্ট হয়ে পড়েছিল ভীষণ দুর্বল, এ কারণে এহেন বিকৃত পরিবেশে নাস্তিক্যবাদীরা নিজেদের বিকৃত মানসিকতা প্রকাশ করার সুযোগ লাভ করে। তারা ইসলামের যেকোন বিষয়কে সেকেলে বলে অভিহিত করে তা বিলীন করতঃ ইউরোপ থেকে আমদানী করা আধুনিকতা অবলম্বন করার অভিযান শুরু করে। পাশ্চাত্যের লেখকরাও এ অভিযানে অগ্রণীর ভূমিকা পালন করে। মিশরের পুরাতন সমাজ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেয়ার জন্য তারা সর্বশক্তি নিয়োজিত করে। Whither Islam গ্রন্থ অধ্যায়ন করলে পাশ্চাত্যের এ ভূমিকা প্রবলভাবে প্রকাশ পায়। পাশ্চাত্য লেখকদের লেখার এ সংকলনটি সম্পাদনা করেন এইচ,এ, আর গিব।

মিশরে পাশ্চাত্যবাদের সবচেয়ে বড় সমর্থক ছিলেন সালামা মূসা। আল-ইয়াওম ওয়াল গাদ (আজ এবং আগামীকাল) গ্রন্থে তিনি স্পষ্ট বলেন, আমাদেরকে এশিয়ার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করে ইউরোপের সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে হবে। এটাই হচ্ছে আমার অভিপ্রায়। আমি সারা জীবন গোপনে এবং প্রকাশ্যে এ জন্য তৎপর ছিলাম। ভবিষ্যতেও আমি এ জন্যই কাজ করে যাবো। আমি প্রাচ্যে অবিশ্বাসী এবং পাশ্চাত্যে বিশ্বাসী। এ বিশ্বাসকে ভিত্তি করে তিনি শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি-রাজনীতি-অর্থনীতি এবং ধর্ম সবকিছুকেই ইসলাম আর প্রাচ্য থেকে মুক্ত করার ডাক দেন। এমনকি প্রকাশ্যেই তিনি ইসলাম নিয়ে উপহাস করেন। তিনি

www.pathagar.com

স্পষ্ট বলেন ঃ আমরা নিজেদেরকে প্রাচ্য আর পাশ্চাত্যের মধ্যে দোদুল্যমান অবস্থায় ছেড়ে দিতে পারি না। সন্দেহ নেই যে, ইউরোপীয় ধারায় দেশে সরকার গঠিত হয়েছে। তবে সরকারের অভ্যন্তরে এখনো কিছু ইসলামী তথা প্রাচ্যের ধাঁচ রয়ে গেছে, যা দেশের উন্নয়নের পথে প্রতিবন্ধক হচ্ছে। যেমন ওয়াকফ মন্ত্রণালয় এবং শরীয়তী আদালত। আমাদের দেশে এমন বিশ্ববিদ্যালয় রয়েছে, যা সভ্য জগতের সংস্কৃতির বিস্তৃতি ঘটাচ্ছে আমাদের মধ্যে। কিন্তু এর পাশাপাশি আল-আয্হার বিশ্ববিদ্যালয় এখনো অন্ধকার যুগের সংস্কৃতি ছড়াচ্ছে। আমাদের মধ্যে মিষ্টারের দল সৃষ্টি হয়েছে। যারা পাশ্চাত্যকে পুরোপুরি বরণ করে নিয়েছে; কিন্তু এখনো কিছুসংখ্যক মোল্লা রয়েছে, যারা এখনো জুব্বা আর পাগড়ি আঁকড়ে ধরে রয়েছে, যারা রাস্তাঘাটে অযু করা থেকে নিবৃত্ত হয় না। যারা এখনো কিবতী আর ইহুদীদেরকে কাফের বলে, যেমন ১৩ শ বৎসর পূর্বে হযরত ওমর (রাঃ) তাদেরকে এ খেতাব দিয়েছিলেন।

সালামা মূসা ইসলাম, ইসলামী মূল্যবোধ আর ইসলামের ইতিহাসের উপর তীব্র হামলা চালান। তাঁর এ গ্রন্থ ১৯২৭ সালে প্রকাশ পায় এবং দীর্ঘদিন ধরে তা যুব সমাজের মন-মানসকে নাস্তিক্যবাদের বিষে বিষিয়ে তোলে। এ গ্রন্থের ক্রিয়া মন-মানস থেকে মুছে যাওয়ার পূর্বেই অপর একটা গ্রন্থ প্রকাশ পায় নতুন আন্দোলনের আকারে। এটা হচ্ছে ডঃ ত্বাহা হোসাইন রচিত মুস্তাকবিলুস সাকাফাহ ফী মিছ্রা (মিশরে সংস্কৃতির ভবিষ্যৎ)। ১৯৩৮ সালে গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। অর্থাৎ ১৯৩৬ সালে বৃটেনের সঙ্গে সম্পাদিত চুক্তির দু'বৎসর পর। ডঃ ত্বাহা হোসাইন মিশরের জন্য ভবিষ্যৎ শিক্ষা পরিকল্পনা পেশ করেন। এ গ্রন্থটি ছিল সালামা মূসার গ্রন্থের চেয়েও মারাত্মক। কারণ, সালামা মূসা ছিলেন কেবল একজন লেখক; কিন্তু ত্বাহা হোসাইন নানা গুরুত্বপূর্ণ পদে নিয়োজিত ছিলেন। আর সেসব পদের বদৌলতে নিজের শিক্ষা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করার ক্ষমতাও তাঁর ছিল। তিনি ছিলেন কায়রো আর্ট কলেজের প্রিন্সিপাল। পরে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ডিরেক্টর এবং কারিগরী উপদেষ্টা হন। পরবর্তীকালে আলেকজান্দ্রিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর এবং সবশেষে শিক্ষামন্ত্রীও হন। তাঁর শিষ্য আর ভক্তের সংখ্যা ছিল বিপুল, যারা তাঁর চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল। এ গ্রন্থে তিনি তিনটি মৌলিক বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

একঃ মিশরকে পাশ্চাত্য সভ্যতার দিকে নিয়ে যেতে হবে এবং ইসলাম ও পুরাতন ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করতে হবে।

দুই ঃ জাতীয়তার বিকাশ ঘটাতে হবে এবং দেশে এমন শাসন ব্যবস্থা চালু

www.pathagar.com

করতে হবে, সেখানে ধর্মের কোন ভূমিকা থাকবে না।

তিন ঃ আরবী ভাষায় যুগোপযোগী পরিবর্তন সাধন করতে হবে, এবং তাকে এমন পথে নিয়ে যেতে হবে, যাতে যে বিশুদ্ধ ভাষায় কুরআন নাযিল হয়েছিল, তার অবসান ঘটে।

তাঁর অপর একটা গ্রন্থ ফিশ্ শি'রিল জাহেলী (জাহেলী যুগের কবিতা প্রসঙ্গে) দ্বারাও নাস্তিক্যবাদী গোষ্ঠী বেশ উদ্বুদ্ধ হয়। লেখক এ গ্রন্থে কবিতা আর সাহিত্যের সেসব মানদণ্ড অস্বীকার করেন, যা অদ্যাবধি চালু ছিল। এর অন্তরালে কুরআন-হাদীসের প্রতি মানুষের আস্থা দোদূল্যমান করার চেষ্টা চালানো হয়েছে। মরহুম মুস্তফা সাদেক রাফেয়ী এ ক্ষেত্রে মূল্যবান কীর্তি সাধন করেছেন। তাঁর রচিত আল মা'রিকা বাইনাল কাদীম ওয়াল জাহীদ (প্রাচীন আর আধুনিকের সংঘাত) এবং তাহ্তা রাইয়াতিল কুরআন (আল কুরআনের পতাকাতলে) গ্রন্থে ডঃ ত্বাহা হোসাইনের মতো লেখকের দাঁতভাঙ্গা জবাব দেয়া হয়েছে।

আমরা ইতিপূর্বে উল্লেখ করছি যে, নির্লজ্জতা ছড়াবার জন্য শুরু করা হয়েছিল এ আন্দোলন। আর এ জন্য চারটা ফ্রন্টে কাজ করা হয়- নারী, পোশাক , শিক্ষা এবং ভাষা ও সাহিত্য। এগুলোর মধ্যে প্রতিটি ফ্রন্টে প্রাণ খুলে নাস্তিক্যবাদ ছড়ানো হয়, চর্চা করা হয় স্বাধীনতা আর লাগামহীনতার। নারী ফ্রন্টেই এ আন্দোলন সবচেয়ে বেশী সাফল্য অর্জন করে। নারী স্বাধীনতার দ্বারতো কাসেম আমীনই উন্মুক্ত করে গেছেন। কিন্তু এখন এ আন্দোলন পোশাকের ক্ষেত্রেও পর্দাহীনতা নয়, বরং উলঙ্গপনার সীমায় উপনীত হয়। নারী কেবল তার হাত আর মুখই উন্মুক্ত করেনি, ধীরে ধীরে সে পদযুগল আর বক্ষ উন্মুক্ত করে দেয়। এমন আঁটশাঁট পোশাক পরিধান করা শুরু করে, যার কাছে উলঙ্গপনাও লজ্জাবোধ করে। রাজনীতির অঙ্গনেও নারী পা বাড়ায়। এ ক্ষেত্রে নেতৃত্ব দানে এগিয়ে আসেন তিনজন নামকরা নারী। একজন হচ্ছেন সা'আদ জগলুল পাশার স্ত্রী ছফিয়া জগলুল। ইনি ছিলেন মুস্তফা কাহমী পাশার কন্যা। আর মুস্তফা ফাহমী পাশাকে মনে করা হতো ইংরেজদের উত্তম বন্ধু। ইংরেজদের শাসনামলে তিনি কয়েকবার প্রধানমন্ত্রীও হয়েছিলেন। দ্বিতীয় নারী ছিলেন হুদা শা'রাবী। আর ইনি ছিলেন আলী শা'রাবী পাশার স্ত্রী এবং সুলতান পাশার কন্যা। মিশরের যেসব নামকরা সামরিক অফিসার ইংরেজদেরকে পুর্ণ সহায়তা, এমনকি প্রয়োজনে আজাদী আন্দোলনকেও দমন করেছিলেন, ইনি ছিলেন তাদের অন্যতম। হুদা শা'রাবী ছিলেন এ ক্ষেত্রে অগ্রণী। নারী স্বাধীনতা নামে তিনি একটা সংগঠনও প্রতিষ্ঠা করেন। সভা-সমাবেশ আর পত্র-পত্রিকার মাধ্যমে ইনি নারীদের মধ্যে আজাদী

www.pathagar.com

আর নির্ভীকতার বাণী প্রচার করেছেন। বস্তুত ইনি নারী সমাজে এমনই আলোড়ন সৃষ্টি করেন, যার ফলে প্রতিটা বিবেকবান পুরুষ চিৎকার করে উঠে।

মিশরের এহেন সামাজিক, রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে ইমাম হাসানুল বান্নার আবির্ভাব হয়েছে। সে যুগের সঠিক চিত্র মানসপটে জাগরুক না থাকলে তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং আন্দোলন সম্পর্কে সঠিক ধারণা লাভ করা সম্ভব নয় বিধায় আমরা তাঁর যুগ আর পরিবেশ সম্পর্কে কিছুটা বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এবার আমরা ইমাম হাসানুল বান্না সম্পর্কে আলোচনা করবো।

ইমাম হাসানুল বান্নার পরিবার

ইমাম হাসানুল বান্নার দাদা ছিলেন শায়খ আব্দুর রহমান বান্না। তিনি ছিলেন মিশরের অন্তপাতী গ্রাম শামশীরার এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিত্ব। তাঁর ছিল দু'পুত্র- একজনের নাম আহমদ, অপর জনের নাম মুহাম্মদ। আহমদ আল-আয্হারে শিক্ষা গ্রহণে মনোনিবেশ করেন, আর মুহাম্মদ গ্রামে কৃষিকাজে পিতার সহায়তা করেন। পিতার মৃত্যুর পর সম্পত্তির বিলি-বন্টন নিয়ে উভয় ভাইয়ের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। মুহাম্মদ চাইতেন তিনি বেশীরভাগ জমির মালিক হবেন। কারণ, এসবের দেখাশুনায় তিনি বেশ কষ্ট করেছেন। এ বিরোধ চরম আকার ধারণ করার উপক্রম ছিল। কিন্তু আহমদ তা নিরসন করলেন। তিনি সমস্ত সম্পত্তি ভাইয়ের হাতে ন্যস্ত করে বসতবাড়ী ত্যাগ করে মাহমুদিয়া নামক গ্রামে গিয়ে বসবাস করেন।

হাসানুল বান্নার পিতা আহমদ ইবনে আব্দুর রহমান মাহমুদিয়ায় অবস্থান করে ঘড়ি মেরামতের কাজ শুরু করেন। তিনি ছিলেন আল-আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাপ্রাপ্ত। দিনের একাংশ তিনি জীবিকা নির্বাহের জন্য ঘড়ি মেরামতের কাজে ব্যয় করতেন, আর অবশিষ্ট সময় কাটাতেন ফিক্হ আর হাদীস অধ্যয়ন এবং কুরআন মজীদের দারস দানের কাজে। তাঁর ব্যক্তিগত পাঠাগার ছিল এবং তাতে ইসলামের বিভিন্ন বিষয়ের মূল্যবান বইপুস্তক ছিল। গ্রামে নতুন মসজিদ নির্মিত হলে সর্বপ্রথম জুমার নামাজ পড়াবার জন্য তাঁকে দাওয়াত দেয়া হয়। তাঁর বক্তৃতায় সকলেই মুগ্ধ হয় এবং সকলের অনুরোধে তিনি ইমামের দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তবে তিনি মসজিদ থেকে বেতন-ভাতা কিছুই গ্রহণ করতেন না। ঘড়ি মেরামত ছিল তাঁর জীবিকা নির্বাহের অবলম্বন। উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে, সময়ের একটা অংশ তিনি অধ্যয়নে ব্যয় করতেন। এ অধ্যয়নের ফলে তিনি

www.pathagar.com

হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থ রচনা ও সম্পাদনা করেন। তিনি ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বলের (রঃ) মুসনাদ ফিক্‌হী ধারায় পুনর্বিন্যাস করেন এবং এর একটা ব্যাখ্যা গ্রন্থও রচনা করেন। তিনি সম্পাদিত গ্রন্থের নামকরণ করেন আল-ফাত্‌হুর রাব্বানী ফী তারতীবে মুসনাদিল ইমাম শায়বানী। তাঁর রচিত হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রন্থের নাম বুলগুল আমানী মিন আসরারিল ফাত্‌হির রাব্বানী। মান্‌হাতুল মা'বুদ নামে আবু দাউদ তায়ালিসীর মুসনাদ সম্পাদনা ও পুনর্বিন্যাস করেন এবং এর ব্যাখ্যাও লিখেন। ইমাম শাফেয়ীর মুসনাদ আর সুনান গ্রন্থও সম্পাদনা করেন এবং তাতে টীকা সংযোজন করেন। বাদায়েউল মুসনাদ নামে এটা প্রকাশও পেয়েছে। তিনি চার ইমামের মুসনাদ গ্রন্থও সম্পাদনা করেন। এসব দেখে মনে হয় তিনি একা এমনসব কাজ করেছেন, যা করা একটা একাডেমীর পক্ষে সম্ভব।

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে পূণ্যবতী জীবন সঙ্গিনীও দান করেছিলেন, ইনি ছিলেন তাকওয়া আর পূণ্যের মূর্ত প্রতীক। এ সংসারে আল্লাহ তাঁকে পাঁচ পুত্র ও দু'কন্যা দান করেন- হাসানুল বান্না, আবদুর রহমান, ফাতেমা, মুহাম্মদ, আব্দুল বাসেত, জামাল এবং ফাওজিয়া। তিনি দ্বিতীয় বিয়ে করেন এবং এ পক্ষে ছিল একটা কন্যা সন্তান-ফরীহা।

জন্ম, লালন-পালন ও শিক্ষা

হাসানুল বান্না ছিলেন পিতার জৈষ্ঠপুত্র। ১৯০৬ সালে মাহমূদিয়া গ্রামে তাঁর জন্ম। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে মিশরের জনপ্রিয় সংগ্রামী নেতা মুস্তফা কামেল দুনিয়া থেকে বিদায় নেন (ওফাত ১৯০৮ সাল)। আল্লাহ তা'আলা ইমাম হাসানুল বান্না দ্বারা মুস্তফা কামেলের শূন্যতা পূরণ করার ব্যবস্থা করেছেন। এটা ছিল প্রকৃতির এক লীলা। মাহমূদিয়া ছিল একটা গ্রাম। গ্রামের অধিকাংশ অধিবাসী ছিল কৃষক। এ গ্রামেই তাঁর প্রাথমিক শিক্ষার হাতে খড়ি হয়। পিতা তাঁকে প্রথমে কুরআন মজীদ হিফ্‌য করান। মাহমূদিয়া গ্রামের একটা প্রাথমিক মাদ্রাসায় তাঁকে ভর্তি করা হয়। এ মাদ্রাসার প্রতিষ্ঠাতা ওস্তাদ মুহাম্মদ জাহরান ছাত্রদের নৈতিক চরিত্র গঠনের প্রতি বেশ মনোনিবেশ করতেন। এ মাদ্রাসার পরিচালনায় পরিবর্তন হলে ওস্তাদ মুহাম্মদ জাহরান শিক্ষকতা ত্যাগ করে অন্য কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তখন তিনি অন্য একটা মাদ্রাসায় ভর্তি হন। এটা ছিল একটা বেসরকারী মাদ্রাসা। ১৯২০ সালে বেসরকারী মাদ্রাসাগুলোকে শিক্ষা দফতরের অধীনে আনা হয়: তখন তাঁর সম্মুখে দুটো পথ ছিল। আলেকজান্দ্রিয়া গমন করে আল-আয্‌হারের অধীনস্থ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ভর্তি হওয়া, অথবা হাসানপুরস্থ টিচার্স ট্রেনিং সেন্টারে ভর্তি হয়ে শিক্ষকতার সনদ লাভ করা। অনেক চিন্তা করে অবশেষে তিনি

www.pathagar.com

দ্বিতীয়টা গ্রহণ করেন এবং টিচার্স ট্রেনিং কলেজের অধীনে স্কুলে ভর্তি হয়ে তিন বৎসরের কোর্স সমাপ্ত করেন। পরীক্ষায় স্কুলে প্রথম এবং সারা দেশে পঞ্চম স্থান অধিকার করেন। এ সময় তাঁকে জেলা বোর্ডের পক্ষ থেকে শিক্ষকতায় যোগদান করার আহ্বান জানানো হয়। কিন্তু শিক্ষকতায় যোগদান না করে তিনি কায়রো বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে দারুল উলুমে ভর্তি হন। তাঁর বয়স তখন ১৬ বৎসরের বেশী হবে না। বয়সের বিচারে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হতে পারেন না। কিন্তু অস্বাভাবিক যোগ্যতার বিষয় বিবেচনা করে তাঁকে ভর্তি করে নেয়া হয়। তখন দারুল উলুম ক্ষুদে আয্হার নামে পরিচিত ছিল। দর্শন, রাজনীতি, অর্থনীতি এবং সমাজবিজ্ঞান ছাড়াও ভাষা শিক্ষার প্রতি বেশ গুরুত্বারোপ করা হতো। এখানে শিক্ষাদানের পদ্ধতিও ছিল আধুনিক। দারুল উলুমে ভর্তি হওয়ার পর তিনি কায়রোয় স্থানান্তরিত হন। এ সময় গোটা পরিবার মাহমূদিয়া থেকে কায়রোয় স্থানান্তরিত হয়। ১৯২৭ সালে তিনি প্রথম স্থান অধিকার করে দারুল উলুম থেকে ডিপ্লোমা লাভ করেন। দারুল উলুমে তিনি সময়কে দু'ভাগে ভাগ করে নেন। একভাগ পড়াশুনায় কাটাতেন আর অপর ভাগ ব্যয় করতেন দাওয়াত আর প্রচার এবং ঘড়ি মেরামতের কাজে পিতার সহায়তায়। দারুল উলুমের শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি ভাবছিলেন স্কলারশীপ নিয়ে উচ্চশিক্ষার জন্য বিদেশে গমন করবেন, বা শিক্ষা বিভাগের চাকুরীতে যোগদান করবেন। এ সময় ঘোষণা দেয়া হয় যে, দেশে শিক্ষকের অভাব। সুতরাং স্কলারশীপ নিয়ে কাউকে বিদেশে যেতে দেয়া হবে না। এ ঘোষণার পর তিনি মত স্থির করেন এবং ইসমাঈলিয়ায় শিক্ষকতার কাজে যোগদান করেন। ইসমাঈলিয়ায় শিক্ষকতায় যোগদানকালে তাঁর বয়স ছিল ২১ বৎসর। ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত তিনি ইসমাঈলিয়ায় অবস্থান করেন।

শিক্ষকতা এবং দাওয়াতের সূচনা

১৯২৭ সালের ১৯ সেপ্টেম্বর শিক্ষকতার দায়িত্বভার গ্রহণ করার জন্য তিনি ইসমাঈলিয়া গমন করেন। এখানে শিক্ষকতার প্রথমদিকে অবসর সময় কাটাতেন তিনি সমাজ সম্পর্কে ধারণা লাভ করার কাজে। সমাজ নিরীক্ষণ শেষে মসজিদের পরিবর্তে কফি হাউজ তথা হোটেল রেস্তোরাকে তিনি দাওয়াত ও প্রচারের জন্য বেছে নেন এবং বেশ কয়েকটা সমাবেশে বক্তব্য পেশ করেন। অল্প কিছুদিনের চেষ্টার ফলে তিনি একটা ভক্তের দল গড়ে তুলতে সক্ষম হন, যাদের সমন্বয়ে একটা সংগঠন গড়ে তোলা যায়। ১৯২৮ সালে তাঁর বাসায় ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তির এক বৈঠকে সকলেই এ ব্যাপারে একমত হন যে, আমাদের জীবন আর মৃত্যু

www.pathagar.com

সবকিছুই হবে আল্লাহর জন্য উৎসর্গীকৃত। এ বৈঠকেই আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন গঠিত হয়। সে ৬ জন বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ছিলেন (১) হাফেজ আব্দুল হামীদ (২) আহমদ আল-হাছরী (৩) ফুয়াদ ইবরাহীম (৪) আবদুর রহমান হাসবুল্লাহ (৫) ইসমাঈল ইজ্জ এবং (৬) জাকী আল মাগরেবী। ১৩৪৮ হিজরী সালের ৫ই মহররম (১৯২৯ খ্রীষ্টাব্দ) ইসমাঈলিয়ায় ইখওয়ানের কেন্দ্র এবং মসজিদের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয়। এরপর কেবল ইসমাঈলিয়ায়ই নয়, বরং সুয়েজ এবং আলেকজান্দ্রিয়ারও স্থানে স্থানে ইখওয়ানের শাখা স্থাপিত হয়। শান্তি-শৃঙ্খলার সঙ্গে মনযিলে মকছুদের দিকে দ্রুত এগিয়ে চলে সত্যের এ কাফেলা।

১৯৩৩ সালের অক্টোবর মাসে হাসানুল বান্নাকে ইসমাঈলিয়া থেকে কায়রোয় বদলী করা হয়। ইসমাঈলিয়ায় ৬ বৎসর অবস্থানকালে তিনি যে কাজ করেছেন, সংগঠনের জন্য 'তা-ই ছিল আসল পুঁজি। তিনি কায়রোয় বদলী হওয়ার পূর্বেই সেখানে ইখওয়ানের দফতর খোলা হয়। কায়রোয় জমিয়তে তাহযীবে ইসলামী (ইসলামী সংস্কৃতি সংস্থা) নামে একটা প্রতিষ্ঠান পূর্ব থেকেই কাজ করছিল। বেশকিছু যুবক এ সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল। কায়রোয় ইখওয়ানের শাখা স্থাপনের পর এ সংগঠনের কর্মকর্তারা ইখওয়ানের সঙ্গে একীভূত হওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। ফলে এ সংগঠনের কায়রোস্থ দফতর আর শাখা ইখওয়ানের দফতরে রূপান্তরিত হয়। ১৯৩৩ সালে হাসানুল বান্না যখন কায়রোয় আগমন করেন, তখন সেখানে ইখওয়ানের কাজ এতই বেড়ে যায় যে, তাঁকে বাধ্য হয়ে শিক্ষকতার কাজ পরিত্যাগ করে সংগঠনের কাজে পুরোপুরী আত্মনিয়োগ করতে হয়।

বিবাহ ও সন্তান

ইসমাঈলিয়ার জনগণ ইমাম হাসানুল বান্নার ভীষণ ভক্ত ছিল। সেখানকার ঈমানদাররাতো তাঁকে নিজেদের মানসিক-আত্মিক শান্তির উপায় বলেই মনে করতো। আলহাজ হোসাইন ছুফী ছিলেন তাদেরই একজন। ইনি ছিলেন সেখানকার অন্যতম শরীফ-সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। ইমাম বান্নার দাওয়াত আর আখলাকে মুগ্ধ হয়ে তিনি ইমামের সঙ্গে গভীর সম্পর্ক স্থাপন করে নেন। অনেক কাজে তিনি ইমামের সাহায্য-সহায়তা আর পৃষ্ঠপোষকতাও করেন। তাঁর সন্তানরাও সকলেই ছিল ইমামের ভক্ত। ইমামের সঙ্গে সম্পর্ক আরো গভীর করার জন্য তিনি ইমামের নিকট কন্যা লতীফাকে বিয়ে দেন। এ বিবাহ সম্পন্ন হয় ১৩৫১ হিজরী সালের ২৭ রমজানুল মুবারক শবে কদরে (১৯৩২ খৃষ্টাব্দে)। এ মহিলা ঈমান আর তাকওয়ায় কতটা অগ্রসর ছিলেন, পরবর্তীকালের ঘটনাপ্রবাহ থেকে তার প্রমাণ

www.pathagar.com

পাওয়া যায়। পবিত্র পুরুষের জন্য পবিত্র নারী- আল্লাহ তাআলার এ বাণীর স্বার্থকতাও প্রতিপন্ন হয়েছে পরবর্তীকালে। এই নেককার মহিলা সুখ-দুঃখ সকল অবস্থায় ইমামের সঙ্গে ছিলেন। অভাব-দারিদ্র্য আর অল্পে তুষ্টিতে তিনি ছিলেন ইমামের পরীক্ষিত জীবন সঙ্গিনী। তাঁর গর্ভে আল্লাহ তা'আলা ইমামকে ৬ জন সন্তান দান করেছেন- ৫ কন্যা আর এক পুত্র। কন্যাদের নাম- সানা, ওফা, রাজা, হাজেরা এবং ইস্‌তিশহাদ এবং পুত্র সন্তানের নাম আহমদ সাইফুল ইসলাম। ইমাম যেদিন শাহাদাত বরণ করেন, সেদিন শেষোক্ত কন্যা সন্তান জন্মগ্রহণ করে। এ কারণে মাতা তার নাম রাখেন ইসতিশহাদ বা নিশান। আহমদ সাইফুল ইসলাম ডাক্তার। চাল চলন, স্বভাব-চরিত্র আর গঠন-অবয়বে সাইফুল ইসলাম অবিকল পিতার মতো। ছাত্র জীবনে সাইফুল ইসলাম সবসময় প্রথম হন। কায়রোয় দারুল উলুম থেকে একই বৎসরে তিনি দু'টি ডিগ্রিও অর্জন করেছেন। জামাল নাসেরের শাসনামলে চাকুরীচ্যুত করে ২৫ বৎসর সশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডিত করা হয়। আরবী প্রবাদ বাক্য হাজাশ শিবলু মিন যাকাল আসাদ (বাঘের বাচ্চা বাঘ হয়) তার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

হাসানুল বান্নার জীবন গঠনে পরিবারের প্রভাব

আল্লাহ তাআলা তাঁর দ্বীনের জন্য যে বান্দাকে বাছাই করে নেন, তার জন্য সবদিক থেকে উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করেন। সে পরিবেশ তাকে শৈশব থেকেই মহান কাজের জন্য প্রস্তুত করে। সাম্প্রতিককালে ইমাম হাসানুল বান্নাকে এ কথার সবচেয়ে বড় প্রমাণ হিসাবে পেশ করা যায়। শৈশব আর যৌবনের পরিবেশ তাঁর মধ্যে এমন এক দৃঢ় চেতনা আর আত্মিক পবিত্রতা লালন করে, যা ছিল একজন সংস্কারকের অপরিহার্য পুঁজি। অন্যদিকে তাঁর মধ্যে গড়ে উঠে এক তীব্র নৈতিক চেতনা, মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা আর ভালো কাজের প্রতি আকর্ষণ। শৈশব থেকে এমনিভাবে তাঁর মন-মানস গড়ে উঠে।

হাসানুল বান্না যে পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন, তা ছিল গ্রামের এক সহজ সরল পরিবার। নগর জীবনের অনেক দোষ ত্রুটি থেকে এ পরিবার ছিল মুক্ত। ভ্রাতৃত্ব আর সহযোগিতা-সহমর্মিতা, আত্মমর্যাদাবোধ আর আন্তরিকতা, সততা, সাধুতা আর সরলতা, কর্মের প্রতি নিষ্ঠা-ঐকান্তিকতা আর শৌর্য-বীর্য- এসব গুণাবলী পরিবার থেকে তিনি লাভ করেন উত্তরাধিকার সূত্রে। ইমামের পিতা ছিলেন আল আয্‌হার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষায় শিক্ষিত ব্যক্তিত্ব। ফিক্‌হ অর হাদীসে তাঁর ছিল গভীর ব্যুৎপত্তি। পরিবারে অভাব-অনটন থাকলেও তাঁর চিত্তে ছিল ঐশ্বর্য আর

www.pathagar.com

প্রাচুর্য। অর্জিত দ্বীনি ইলমকে তিনি জীবিকা উপার্জনের হাতিয়ারে পরিণত করেননি; বরং ঘড়ি মেরামতের কাজ দ্বারা জীবিকা নির্বাহের ব্যবস্থা করেন। এমনিভাবে মায়ের কোল আর পিতার সাহচর্য থেকেই তিনি জ্ঞান ও আমলের আদর্শ নমুনা লাভ করেন। তিনি পিতার নিকট থেকে শিখতে পান যে, অর্জিত জ্ঞান হতে হবে কল্যাণকর আর আমল হতে হবে নেক। আর এভাবে তাঁর নিজের মধ্যেও এসবের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টি হয়। পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা সম্পর্কে শহীদের ছোট ভাই আবদুর রহমান আল-বান্না তাঁর শাহাদাত লাভের পর প্রণীত এক নিবন্ধে বলেন ঃ

বড় ভাইয়ের বয়স যখন নয় বৎসর, তখন আমার বয়স সাত বৎসর। আমরা দুজনে মক্তবে কুরআন মজীদ হিফ্য করতাম, আর ব্লাকবোর্ডে লিখতাম। তিনি যখন কুরআন মজীদের দুই তৃতীয়াংশ হিফ্য শেষ করেন, তখন আমি কেবল এক-তৃতীয়াংশ অর্থাৎ সূরা বাকারা থেকে সূরা তাওবা পর্যন্ত হিফ্য শেষ করেছি। আমরা মক্তব থেকে প্রত্যাবর্তন করলে পিতা সস্নেহে আমাদেরকে বরণ করে নিতেন। তিনি আমাদের সেবায় আত্মনিয়োগ করতেন। মুহতারাম আব্বাজান আমাদেরকে নবীজীর পবিত্র জীবনের পূত-পবিত্র অধ্যায়, ফিক্হ, ফিক্হের মূলনীতি (উসলে ফিক্হ) এবং আরবী ব্যাকরণের নানা অধ্যায় মুখে মুখে পড়াতেন। মহান পিতা আমাদের জন্য একটা পারিবারিক কোর্স ঠিক করে রেখেছিলেন, যা তিনি আমাদেরকে নিয়মিত পড়াতেন। বড় ভাই তাঁর কাছে হানাফী ফিক্হ পড়তেন আর আমি পড়তাম মালেকী ফিক্হ। তিনি আরবী ব্যাকরণের আলফিয়া গ্রন্থ পড়তেন, আর আমি পড়তাম মালহামাতুল এ'রাব গ্রন্থ।

আমরা দু'জনে সবক ইয়াদ করতাম এবং এজন্য বেশ পরিশ্রম করতাম। এজন্য সময়কে বিন্যস্ত করে সমস্ত কাজের একটা রুটিন তৈয়ার করা হয়। বড় ভাইয়ের চেয়ে বেশী রোযা রাখতে এবং বেশী নামায পড়তে আমি আর কাউকে জীবনে দেখিনি। তিনি সাহরীর সময় জাগতেন, কিয়ামুল লাইল তথা তাহাজ্জুদের নামায পড়তেন, অতঃপর ফজর নামাযের জন্য আমাকে জাগাতেন। নামায, শেষে আমাকে কাজের রুটিন পড়ে শুনাতেন। তাঁর শব্দ এখনো আমার কানে বাজে। তিনি বলতেন, ভোর পাঁচটা থেকে ছয়টা পর্যন্ত কুরআন মজীদ অধ্যয়ন করার সময়। ছয়টা থকে সাতটা পর্যন্ত হাদীস আর তাফসীর অধ্যয়ন করার সময়। সাতটা থেকে আটটা পর্যন্ত পড়তে হবে ফিকহ এবং উসূলে ফিকহ। এটা ছিল আমাদের ঘরের পড়া। এরপর আমরা মক্তবে গমন করতাম।

মহান পিতার বিশাল লাইব্রেরীতে ছিল অনেক গ্রন্থ। আমরা ক্ষুদে চোখ দিয়ে

www.pathagar.com

গ্রন্থগুলো দেখতাম। গ্রন্থগুলোর নাম লিখা ছিল সোনালী হরফে। আমরা কখনো 'নীশাপূরী' নিতাম, কখনো নিতাম 'কাসতালানী' আর 'নাইলুল আওতার।' আব্বাজান আমাদেরকে অনুমতি দিতেন, এমনকি তাঁর লাইব্রেরী দেখাশুনা করার জন্য উৎসাহিত- অনুপ্রাণিতও করতেন। বড় ভাই এ ব্যাপারেও আমার চেয়ে এগিয়ে ছিলেন। আমি তাঁর সমকক্ষ হওয়ার চেষ্টা করতাম। কিন্তু কোথায় আমি, আর কোথায় তিনি। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ মানুষ। আমাদের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র দু'বৎসরের। কিন্তু আল্লাহ্‌র ইচ্ছা তাঁকে এক মহান কাজের জন্য প্রস্তুত করছিল।

মরহুম আব্বাজানের মজলিশে যুক্তিপূর্ণ তাত্ত্বিক আলোচনা চলতো। আমরা এসব আলোচনা শুনতাম। কখনো কখনো অন্যান্য আলেমদের সঙ্গে আব্বাজানের বেশ বিতর্কও চলতো। আমরা মনোযোগের সঙ্গে এসব বিতর্ক শ্রবণ করতাম। আব্বাজানের মজলিশে শায়খ মুহাম্মদ জাহ্‌রানও উপস্থিত হতেন। মুহতারাম ওস্তাদ হামেদ মোহাইমেনও আগমন করতেন এবং নানা বিষয়ের তাত্ত্বিক ও জ্ঞানগর্ভ আলোচনায় আসর সরগরম হয়ে উঠতো। উদাহরণ হিসাবে বলা চলে, আমরা তাঁকে ইস্তিওয়া আলাল আরশ বিষয়ে আলোচনা করতে শুনেছি। এখানে ইস্তিওয়া অর্থ কি আরোহন করা, না অধিষ্ঠান? এ সম্পর্কে ইমাম গাজ্জালীর কি মত? আল্লামা জারুল্লাহ যামাখ্‌শারী কি বলেন? আর ইমাম মালেক ইবনে আনাস (রাঃ) থেকে যে উক্তি বর্ণিত আছে, তারইবা তত্ত্ব কি? আমরা বেশ মজা করে এসব আলোচনা শুনতাম। যেসব কথা আমরা বুঝতে পারতাম, তা লিখে রাখতাম, আর যেসব সূক্ষ্ম ও তাত্তিক কথা বুঝতে পারতাম না, সেসব সম্পর্কে আব্বাজানের নিকট জেনে নিতাম, অথবা তাফসীর গ্রন্থে তা তালাশ করতাম। আমি সে দিনের কথা ভুলতে পারবো না, যেদিন আহমূদিয়ায় আমাদের গৃহের আঙ্গিনা ভরে উঠেছিল ছোটমণিদের কলকাকলিতে। এরা ছিল মক্তবের শিশু। তাদের সঙ্গে ছিলেন মনিটর আর মিয়াজীও। তাঁদের সঙ্গে স্ত্রীরাও ছিলেন। শিশুদের পরণে রংবেরঙ্গের পোশাক। প্রতিটি শিশুর হাতে ছিল খেজুরের ডাল। খেজুর ডালের মাথা চিরে তাতে একটা রঙ্গিন কাগজ ঝুলানো ছিল। এতে ছিল বৃক্ষ বা নৌকার ছবি। শিশুরা খেজুরের ডাল হাতে নিয়ে উপরে তুলে উচ্চস্বরে এ গান গাইছিল ঃ صلوا ياحضار علي النبي المختار

তোমরা যারা হাজির
দরূপ পাঠ কর
পাক নবীর উপর।

www.pathagar.com

আর মিয়াঁজী এ কবিতাটি আবৃত্তি করছিলেন ঃ

না, না, আমরা ফিরে যাবো না, لا ننصرف حتي تجينا الفضة

যতক্ষণ না আসবে আমাদের কাছে

স্বচ্ছ একটা পাত্রে ভরা في طاسة مجلوة مبيضة

উজ্জ্বল রূপালী নাশতা।

মিয়াঁজির এ কবিতা আবৃত্তির পর শিশুরা তাদের গান গাইতে থাকতো। আম্মাজান একটা পাত্রে ভরে নিয়ে আসতেন রূপালী নাশতা। সাথে থাকতো একটা কেক আর কিছু পিঠা। এসবে শিক্ষয়িত্রীর থলে ভরে যায়। মিয়াঁজিও ফিরে যান। বড় ভাই কুরআন মজীদ হিফ্য শেষ করেছেন। সে উপলক্ষেই এ অনুষ্ঠানের আয়োজন (আল-ইমাম আলশহীদ হাসানুল বান্না, পৃষ্ঠা ১০-১১)।

হাসানুল বান্নার পারিবারিক শিক্ষা-দীক্ষা প্রসঙ্গে জমিয়তুশ শুব্বান আল মুসলিমীন (মুসলিম যুব সংঘ) মিশরের প্রথম সভাপতি জেনারেল মুহাম্মদ সালেহ হারব পাশা বলেন ঃ

আমার মতে শহীদ মুরশিদের ব্যক্তিত্ব গঠনে তাঁর পরিবেশের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। একটা নেক্কার দ্বীনদার জ্ঞানী-গুণী পরিবারে তাঁর জন্ম। পারিবারিক পরিবেশ তাঁর ব্যক্তিত্বে বিরাট প্রভাব ফেলেছে। তিনি যে শিক্ষা লাভ করেছেন, ইসলাম আর উন্নত চরিত্রের স্পীরিটে তা ছিল কানায় কানায় পরিপূর্ণ। জীবনের শুরুতেই তিনি তাসাউউফ আর আধ্যাত্মিকতার জগতে প্রবেশ করেন। ইসলাম অনুধাবন, কুরআন হিফ্য কুরআনের স্পৃহা, কুরআন ও সুন্নার সূক্ষ্ম তত্ত্ব অনুধাবন এবং ফিকহ্ বিষয়ে মহান মুরশিদ ছিলেন নজীরবিহীন। তাঁর জ্ঞানের এসব পুঁজি ছিল এমন এক ঝর্নার মতো, যা কখনো শুষ্ক হতো না, তার প্রবাহেও দেখা দিতো না কোন প্রতিবন্ধকতা। ঈমান ও ইসলামের প্রতি আহ্বানের কাজে তাঁর জ্ঞানের এ পুঁজি বিরাট সহায়ক হয়েছে। কথাবার্তা, জ্ঞান-বক্তৃতা আর লেখায় এ ঝর্ণা দ্বারা তিনি নিজেও তৃপ্ত হতেন এবং অন্যদেরকেও তৃপ্ত করতেন (আল ইমাম আশ শহীদ হাসানুল বান্না, পৃষ্ঠা ১২৮)।

www.pathagar.com

নিজ জনপদের ক্ষুদে আহ্বানকারী

আল্লাহ তা'আলা হাসানুল বান্নাকে সংস্কার-সংশোধন আর জিহাদ ও নছিহতের যে প্রেরণায় উদ্দীপ্ত করেছিলেন, তা জীবনের প্রতিটি পর্যায়ে প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে তিনি ইসমাঈলিয়ায় ইখওয়ানুল মুসলিমুন প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু ইখওয়ানুল মুসলিমুন প্রতিষ্ঠার পূর্ববর্তী তার জীবন বলে দেয় যে, এ ব্যক্তি অস্বাভাবিক কর্মপ্রেরণা নিয়ে পৃথিবীতে আগমন করেছেন। কেবল মিশরেই নয়, বরং গোটা মুসলিম জাহানে এর প্রভাব প্রতিফলিত হবে। তিনি যখন গ্রামের ক্ষুদ্র পরিবেশে ছিলেন, এবং মক্তবে শিক্ষা লাভ করতেন, তখনো তাঁর মধ্যে এ উদ্দীপনা কার্যকর ছিল। মক্তবে অধ্যয়নকালে কয়েকজন সহপাঠি নিয়ে তিনি একটা আসর প্রতিষ্টা করেন। তিনি এ আসরের নামকরণ করেন জমিয়তে আখলাকে আদব তথা নৈতিক সাহিত্যের আসর। তিনি এ আসরের সভাপতি নির্বাচিত হন। ছাত্রদের মধ্যে সৎ স্বভাব বিকশিত করা ছিল এ আসরের লক্ষ্য। এ আসরের সীমাবদ্ধ কাজে তাঁর মন ভরে উঠেনি বিধায় তিনি বিদ্যালয়ের পরিমণ্ডলের বাইরে অপর একটা সংগঠন গড়ে তোলেন এবং এ সংগঠনের নামকরণ করেন জমিয়তে ইনসিদাদে মুহররমাত-হারাম প্রতিরোধ সংস্থা। এ সংগঠন গ্রামের বাইরের জনগণকে হারাম কাজ পরিহার করে চলার আহ্বান জানায় এবং পত্র প্রেরণ দ্বারা তাদেরকে নেকী আর কল্যাণের দীক্ষা দেয়।

হাসানুল বান্না যখন আর রাশাদ আদদ্বীনিয়া মাদ্রাসার ছাত্র, তখন একদিন তিনি মাহমুদিয়ার নদীর নিকট দিয়ে গমন করছিলেন। তখন নদীর তীরে ছিল একটা নৌকা। নৌকার বাদামের সঙ্গে ঝুলানো ছিল একটা নগ্ন নারী মূর্তি। এ পথে অনেক নারীও যাতায়াত করতো। এ খারাপ দৃশ্য দেখে তিনি সহ্য করতে পারেননি। সঙ্গে সঙ্গেই তিনি স্থানীয় পুলিশ পোষ্টে গমন করে পুলিশ অফিসারের নিকট এ মূর্তির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। পুলিশ অফিসার একজন ক্ষুদে ছাত্রের ঈমানের তেজ দেখে বিস্মিত হন এবং মাঝির নিকট গমন করে মূর্তি অপসারণ করার নির্দেশ দেন। পরদিন পুলিশ অফিসার মাদ্রাসায় গমন করে একজন ছোট ছাত্রের ঈমানের তেজের প্রশংসা করেন মাদ্রাসা প্রধানের কাছে।

দামানহুরের স্কুলে দাওয়াত ও প্রচার

হাসানুল বান্না যখন দামানহুরের টিচার্স ট্রেনিং স্কুলে গমন করেন, তখন তিনি সঙ্গে নিয়ে যান সংস্কার, সংশোধনের স্বভাবজাত উদ্দীপনা। স্কুলের অভ্যন্তরেও

www.pathagar.com

তাঁর সম্পর্ক গড়ে উঠে স্কুল আঙ্গিনার ক্ষুদ্র মসজিদটির সঙ্গে। তিনি এ মসজিদে যথারীতি জামায়াতের সঙ্গে নামায আদায় করার ব্যবস্থা গড়ে তোলেন। এখানে হাছাফিয়া সিলসিলার অনুসারীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় হয় এবং তিনি তাদের জিকরের মসলিশে যোগদান করেন। এসব জিকরের মজলিশে হাসানুল বান্নার আমর বিল মারুফ ও নাহী আনিল মুনকার তথা ভালো কাজের নির্দেশ এবং মন্দ কাজে বাধাদানের জয়বা উদ্দীপনা আরো চাঙ্গা হয়ে উঠে। মানুষের আত্মিক দিক চাঙ্গা করে তোলার বিশেষ ক্ষমতা দান করেছেন আল্লাহ তাআলা তাঁকে। একজন সূফী ব্যবসায়ীর সঙ্গে তাঁর যোগাযোগ স্থাপিত হয়। এই সূফী স্কুলের ছাত্রদেরকে সপ্তাহান্তে একবার কবরস্তান জিয়ারতের জন্য নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করেন। জীবন যে নশ্বর, কবর জিয়ারত করতে গিয়ে তাদের মনে সে ধারণা বদ্ধমূল হয়। সেখানে তাদেরকে শোনানো হয় মুত্তাকী-নেককারদের জীবন কাহিনী। এসব কাহিনী শ্রবণ করে তাদের অন্তর বিগলিত হতো। আর চক্ষু হতো অশ্রুসিক্ত। আল্লাহ এবং রাসূলের আনুগত্যের জোয়ার সৃষ্টি হতো তাদের মধ্যে। হাছাফিয়া সিলসিলার অনুসারীদের সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক এতটা বৃদ্ধি পায় যে, তিনি তাদেরকে সঙ্গে নিয়ে জমিয়তে হাছাফিয়া আল-খাইরিয়া (হাছাফী ভাইদের সেবা সংস্থা) প্রতিষ্ঠা করেন। এ সংস্থা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্য ছিল ২টি। একঃ উন্নত চরিত্রের দিকে আহ্বান জানানো এবং ঘৃণ্য ও হারাম কার্য বন্ধ করা। দুইঃ খৃষ্টান মিশনারীদের কার্যক্রমে বাধা দান। শিক্ষা, চিকিৎসা আর এতীমখানার আড়ালে মূলত এসব মিশনারীরা খৃষ্টবাদ প্রচার করছিল।

দামানহুরে হাসানুল বান্না আরো একটা প্রশংসনীয় কাজ করেন। তিনি সাহরীর সময় শয্যা ত্যাগ করতেন। নিজে তাহাজ্জুদের নামায আদায় করে গোটা এলাকার মুয়াযযিনদেরকে জাগাবার জন্য বেরিয়ে পড়তেন। মুয়াযযিনরা আযান দানকরা শুরু করলে হাসানুল বান্না তাদের আযানের শূরে এক অনাবিল আনন্দ উপভোগ করতেন। তখন তাঁর রূহানী অবস্থা চরম পর্যায়ে উন্নীত হতো। দুনিয়ায় যারা হিদায়াত আর পথ প্রদর্শনের কাজ করতে আগ্রহী; শহীদ হাসানুল বান্নার জীবনের এ দিকটি তাদেরকে বিশেষভাবে অধ্যয়ন করতে হবে। দামানহুরে অবস্থানকালে তিনি আত্মসংযম আর ছবর ও অল্পে তুষ্টির বিরাট সম্বল সঞ্চয় করে নেন। পরবর্তী জীবনের প্রতি পদে পদে এ সম্বল কাজে লেগেছে।

হাসানুল বান্না কায়রোয়

তিনি যখন কায়রোর দারুল উলূমে ভর্তি হন, তখন তিনি সীমাবদ্ধ সমাজ

www.pathagar.com

থেকে বেরিয়ে এক নতুন সমাজে প্রবেশ করেন। পূর্বের সমাজ আর পরিবেশের তুলনায় বর্তমান এ পরিবেশ ছিল অনেক বিস্তীর্ণ। উভয় পরিবেশের মধ্যে গুণগত দিক থেকেও ছিল পার্থক্য। মাহমূদিয়া আর দামানহুরের জীবন এবং কায়রোর জীবনের মধ্যে কোন সাদৃশ্য ছিল না। কায়রো ছিল রাজনৈতিক আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল। এখানে জ্ঞান আর সংস্কৃতির পরিধি ছিল দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রসারিত। এখানে প্রাচীন রীতির ভালো মানুষের নমুনাও পাওয়া যেতো এবং নৈতিক আর সামাজিক বিপর্যয়ের নতুন নতুন স্রোতও দেখা যেত। এসব দেখে হাসানুল বান্নার মধ্যে সংস্কার আন্দোলনের নব উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় এবং যে হারে বিপর্যয় দেখা দিয়েছে, সে হারে কাজ করার উৎসাহ-উদ্দীপনা সৃষ্টি হয় তাঁর মধ্যে। একদিকে বাইরের পরিবেশ আর অপরদিকে অভ্যন্তরীণ অনুভূতি তাঁকে ব্যাকুল আর অস্থির করে তুলেছে। এ সময় তিনি কায়রোর সমাজ সংস্কার সংস্থায় যোগদান করে সমাজ থেকে বিপর্যয় দূর করার কাজ অব্যাহত রাখেন। এ সংস্থাটির নাম ছিল জমিয়তে মাকারেমে আখলাক (নৈতিক চরিত্র গঠন সংগঠন)। তখনকার দিনে কায়রোর বিকৃত-বিপর্যস্ত পরিবেশে এটা ছিল একমাত্র সমাজ সংস্কার প্রতিষ্ঠান। এ সংগঠনের দারসসহ অন্যান্য কার্যক্রমে তিনি নিয়মিত অংশগ্রহণ করেন।

কফি হাউজে দাওয়াতের কাজ

কিন্তু সামাজিক আর নৈতিক অবক্ষয় এবং পশ্চিমা ভাবধারায় কায়রো যেভাবে তলিয়ে যাচ্ছিল, হাসানুল বান্নার মতে মসজিদের খতীব আর ওয়ায্কারীদের পক্ষে তা রোধ করা সম্ভব ছিল না। হাসানুল বান্না এ উদ্দেশ্যে দারুল উলূম এবং আল-আয্হারের ছাত্রদের সমন্বয়ে একটা গোষ্ঠী গড়ে তোলেন এবং এদের দ্বারা কফি হাউজ এবং অন্যান্য জনসমাবেশ স্থলে দারস দান আর ওয়ায-নছিহতের কাজ শুরু করেন। কফি হাউজ আর অন্যান্য উপযুক্ত স্থানে প্রতিদিন বিকালে হাজার হাজার লোকের সমাবেশ হতো নিছক বিনোদনের জন্য। এ গোষ্ঠীর অগ্রনায়ক ছিলেন ইমাম হাসানুল বান্না। এরা কফি হাউজে গমন করে কুরআন-হাদীসের দারস দান করতো এবং গল্প-গুজবে সময় কাটাবার পরিবর্তে দ্বীনের দাবী পূরণ করার প্রতি সকলের দৃষ্টি আকৃষ্ট করে। এ ধারার ওয়ায আর উপদেশের প্রতি ওলামা-মাশায়েখদের পক্ষ থেকে বার বার অঙ্গুলী সংকেত করা হলেও তা সফল হয়েছে এবং শহর ছাড়িয়ে সুদূর গ্রামে-গঞ্জেও এর পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে। এ দলের ভিতর থেকে একটা কমিটি গঠিত হয়। ইসলামী দাওয়াত সম্প্রসারণের কাজ দেখাশুনা করার দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয় এ

www.pathagar.com

কমিটির উপর। গ্রীষ্মকালীন ছুটির সময় এ দলটি অস্বাভাবিকভাবে সক্রিয় হয়ে উঠতো এবং শহর আর গ্রাম-গঞ্জে ছড়িয়ে পড়তো। এ ধরনের দাওয়াত দ্বারা হাসানুল বান্না দু'টা বিষয় উপলব্ধি করেন। এক ঃ নিজের প্রতি আস্থা আর দ্বিতীয়তঃ সাধারণ মানুষের মানসিকতা সম্পর্কে সঠিক ধারণা।

আলেম সমাজের খেদদমতে

কিন্তু তুরস্কের ধর্মহীন আন্দোলনের যেসব প্রভাব মিশরের উপর পতিত হচ্ছিল আর ধর্মবিরোধী আন্দোলনের যে সয়লাব সর্বনাশা রূপ নিয়ে এগিয়ে আসছিল, তার সম্মুখে এই সীমাবদ্ধ ও অক্ষম প্রতিরোধ ছিল ক্রিয়াহীন। হাসানুল বান্নার দৃষ্টিতে পরিস্থিতি কোন বড় এবং সংঘবদ্ধ কাজ দাবী করছিল। তিনি অস্থির হয়ে ওলামা-মাশায়েখদের নিকট ছুটে যান এবং তাঁদের মধ্যে দায়িত্বের অনুভূতি জাগ্রত করার চেষ্টা করেন। তিনি সৈয়দ রশীদ রেজার সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন। আল-আয্হারের নামকরা আলেমে দ্বীন শায়খ ইউসুফ দাজবীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তাঁকে উদ্দীপ্ত করে বলেন, নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারার সমর্থক পত্র-পত্রিকায় যেখানে কায়রো শহর পরিপূর্ণ, সেখানে বড় আকারের একটা পত্রিকা হলেও প্রকাশ করা উচিত, যা আধুনিক মূর্খতার সূতীকাগারে সত্যের আওয়াজ বুলুন্দ করার দায়িত্ব পালন করতে পারে। সালাফিরা প্রকাশনা সংস্থার মালিক মুহিবুদ্দীন আল-খতীবের সঙ্গেও যোগাযোগ স্থাপন করেন। আল-আয্হার বিশ্ববিদ্যালয়ের রেক্টর শায়খ মুহাম্মদ খিজির হোসাইনের সঙ্গে দেখা করে নাজুক পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করে এদিকে তাঁর দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। মিশরের অন্যতম খ্যাতনামা পন্ডিত আল্লামা ফরীদ বেজদী আফেন্দীর সঙ্গেও সাক্ষাৎ করে তাঁকে তৎপর করে তোলার চেষ্টা চালান। সেকালে এসব ব্যক্তিত্ব ছিলেন মিশরের শীর্ষস্থানীয় আলেম ও বুদ্ধিজীবী। হাসানুল বান্না এক এক করে সকলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নাস্তিকতার সর্বগ্রাসী সয়লাব রোধের নিমিত্ত একটা কিছু করার জন্য তাঁদেরকে উদ্বুদ্ধ করেন। তাঁর এসব চেষ্টার তেমন উল্লেখযোগ্য ফল দেখা দেয়নি। অবশ্য মুহিববুদ্দীন আল-খতীব 'আল-ফাতাহ' নামে একটা সাপ্তাহিক সংবাদপত্র প্রকাশ করেন। সেকালে এ পত্রিকাটি ইসলামী ফ্রন্টে অতীব মূল্যবান ভূমিকা পালন করেছিল।

হাসানুল বান্নার মধ্যে সংস্কারকের সমস্ত গুণের সমাবেশ ঘটেছিল। পূত-পবিত্র স্বভাব-চরিত্র, সাহস ও দৃঢ়তা, উৎসাহ-উদ্দীপনার আগুন এবং শিক্ষা ও জ্ঞানের পুঁজি- এসব গুণাবলী আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর জন্য অপরিহার্য।

www.pathagar.com

হাসানুল বান্না এসব গুণে ভালোভাবেই বিভূষিত ছিলেন। অন্য কাউকে ডাকাডাকি না করে একাকী কাজ শুরু করে দেয়ার মতো সাহস আর যোগ্যতা অবশ্যই তাঁর মধ্যে ছিল। ইমাম হাসানুল বান্নার অন্যতম সঙ্গী ও সহকর্মী শায়খ মুহাম্মদ আল-গাযালী (যিনি মাত্র কিছুদিন আগে ইন্তেকাল করেছেন) তাঁর সম্পর্কে বলেন ঃ

সফল-স্বার্থক নেতা তিনি, যিনি পূর্ব থেকে চলে আসা উপায়-উপকরণের সঠিক ব্যবহার করতে পারেন। আর সবচেয়ে স্বার্থক নেতা হচ্ছেন তিনি, যিনি নিজেই উপায়-উপকরণ সৃষ্টি করে কাজের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেন। ইমাম হাসানুল বান্না ছিলেন এই শ্রেণীর নেতা।

দারুল উলূমের পক্ষ থেকে ইমাম হাসানুল বান্নাকে যে সন্দর্ভ রচনা করতে দেয়া হয়, তার শিরোনাম ছিল ঃ শিক্ষা জীবন শেষে তুমি কি করতে চাও এবং সে জন্য কি উপকরণ ব্যবহার করবে? এ সন্দর্ভে তিনি যা লিখেন, তার সার সংক্ষেপ এই ঃ

ছাত্রজীবন শেষে আমি দায়ী ইলাল্লাহ তথা আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী এবং শিক্ষক হতে চাই। বছরের অধিকাংশ সময় দিনের বেলা নিয়োজিত থাকতে চাই মিশরের নব প্রজন্মকে শিক্ষা দানের কাজে আর রাত্রিবেলা এবং ছুটির অবসর সময় ব্যয় করতে চাই ছাত্রদের পিতা-মাতাকে দ্বীনের উদ্দেশ্য সম্পর্কে অবহিত করার কাজে। আমি তাদেরকে অবহিত করবো যে, সৌভাগ্যের উৎস কোথায় নিহিত রয়েছে, এবং জীবনে সত্যিকার আনন্দ কিভাবে উপভোগ করা যায়। এ উদ্দেশ্যের জন্য আমার আয়ত্বাধীন সকল উপায়-উপকরণ কাজে নিয়োজিত করবো। ব্যক্তিগত সংলাপ আর ভাষণ-বক্তৃতা, গ্রন্থ রচনা, দেশের অলিগলি আর আনাচে-কানাচে ঘুরে বেড়ানো- এক কথায় সকল কার্যকর অস্ত্র কাজে লাগাবো।

এ হচ্ছে সে নওজোয়ানের অভিপ্রায়, যিনি তখনো জীবনের দুই দশক অতিক্রান্ত করেননি। এ বয়সেই তিনি কেবল নিজেকেই নয়, বরং সমাজকেও রক্ষা করার অভিপ্রায় ব্যক্ত করেছেন।

হাসানুল বান্নার ভাই আব্দুর রহমান আল-বান্না লিখেনঃ একদিন শৈশবে ভাই হাসানুল বান্না আমার হস্ত ধারণ পূর্বক বলেন, আবদুর রহমান। আমরা উভয়ে কি সূরা আলে ইমরানে আল্লাহ তাআলার এ বাণী মুখস্ত করিনি? ولتكن منكم امة يدعون الى الخير ويامرون بالمعروف وينهون عن المنكر

'তোমাদের মধ্যে অবশ্যই এমন একটা দল থাকতে হবে, যারা কল্যাণের প্রতি আহ্বান জানাবে, ভালো কাজের নির্দেশ দেবে এবং মন্দ কাজ থেকে বারণ করবে।'

www.pathagar.com

আমি বললাম, ঠিকই তো, আমরা এ আয়াত মুখস্ত করেছি। ভাই তখন আমাকে বললেন, তাহলে এসো, আমরা কিছু কাজ করি। তদনুযায়ী তিনি গ্রামে একটা সমিতি গড়ে তোলেন। এ সমিতির নাম ছিল হারাম প্রতিরোধ সমিতি-জমিয়তে ইনসিদাদে মুহররমাত। যৌবনে যার অবস্থা ছিল এরকম, পরিণত বয়সে তিনি কেমন করে উপকরণ সংগ্রহ আর পরিবেশ-পরিস্থিতির আনুকূল্যের অপেক্ষায় বসে থাকতে পারেন?

ইসমাঈলিয়ায় ইখওয়ানুল মুসলিমূন প্রতিষ্ঠা

কায়রোস্থ দারুল উলূমের শিক্ষা সমাপনান্তে তাঁকে ইসমাঈলিয়ার একটা স্কুলে শিক্ষক নিযুক্ত করা হয়। এটা ১৯২৭ সালের কথা। ইসমাঈলিয়া পৌঁছে একজন বিচক্ষণ ব্যক্তি হিসাবে শহরটা নিরীক্ষণ করে কর্মপন্থা ঠিক করেন। এখানে তিনি সাধারণ লোকদের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন এবং কফি হাউসকে কেন্দ্র করে কাজ শুরু করেন। তাঁর অনলবর্ষী বক্তৃতা আর মিষ্টি কথা সকলকে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে তোলে। তিনি হয়ে উঠেন সকল মহলের নিকট জনপ্রিয়। সাম্রাজ্যবাদ মিশরের জনগণের ঘাড়ে সওয়ার হয়ে কিভাবে চাবুক মারছে, এখানে তিনি তা-ও দেখার সুযোগ লাভ করেন। ইসমাঈলিয়া ছিল ইংরেজ সৈন্যদের ছাউনী বা সেনানিবাস। এহেন পরিবেশ হাসানুল বান্নার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদ বিরোধী বিদ্বেষ আরো তীব্র করে তোলে। এখানে জনগণের মধ্যে ইসলামী জাগরণ সৃষ্টির সঙ্গে সঙ্গে মিশরের জনগণকে সাম্রাজ্যবাদের থাবা থেকে মুক্ত করার প্রেরণাও তাঁর মধ্যে জেগে উঠে। এখানে ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে তাঁর বাসায় ইখওয়ানুল মুসলিমূন প্রতিষ্ঠা লাভ করে। ইসলামের পুনরুজ্জীবন এবং ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে ইসলাম প্রতিষ্ঠা ছিল এর লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। এ মহান লক্ষ্য অর্জনের নিমিত্ত তাঁরা যে কর্মপন্থা নির্ধারণ করেন, তার ছিল ৪টি স্তর।

প্রথম স্তর ঃ الفرد المسلم ব্যক্তি জীবনে প্রতিটি মুসলিমকে সত্যিকার অর্থে মুসলমানে পরিণত করা।

দ্বিতয়ি স্তর ঃ الاسرة المسلمة ইসলামী পরিবার গঠন।

তৃতীয় স্তর ঃ الامة المسلمة সত্যিকার অর্থে ইসলামের অনুসারী মিল্লাত গড়ে তোলা। আর

চতুর্থ স্তর ঃ الحكومة المسلمة ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা। ইখওয়ান প্রতিষ্ঠার পর ১৯৩৩ সাল পর্যন্ত প্রায় পাঁচ বৎসর হাসানুল বান্না ইসমাঈলিয়ায় অবস্থান করেন। প্রথম

www.pathagar.com

দু'বৎসরে সেখানে দারুল ইখওয়ান তথা ইখওয়ান ভবন নামে একটা কেন্দ্র এবং একটা মসজিদ নির্মাণ করা হয়। এ সময় আবু ছবীর, পোর্ট সাঈদ, বালাহ এবং শাবরাখীত-এ ইখওয়ানের শাখা কায়েম করা হয়। তৃতীয় বৎসর সুয়েজেও একটা শাখা প্রতিষ্ঠা লাভ করে। চতুর্থ বর্ষে আরো ১০টি শাখা স্থাপন করা হয়। ইসমাঈলিয়ায় বালক এবং বালিকাদের জন্য বিদ্যালয় স্থাপন করা হয়। বালকদের জন্য স্থাপিত বিদ্যালয়ের নাম ছিল আলহেরা মাদ্রাসা আর বালিকা বিদ্যালয়ের নাম ছিল উম্মাহাতুল মু'মিনীন মাদ্রাসা। অন্যান্য শাখার সঙ্গে একটা মসজিদ এবং কোথাও কোথাও একটা ক্লাবও স্থাপন করা হয়।

ইসমাঈলিয়া থেকে কায়রোয় বদলী

১৯৩৩ সালে হাসানুল বান্না ইসমাঈলিয়া থেকে কায়রোয় বদলী হন। তাঁর বদলী হওয়ার ফলে ইখওয়ানের সদর দফতরও কায়রোয় স্থানান্তরিত হয়। কায়রোয় স্থানান্তরের ফলে ইখওয়ানের কর্মতৎপরতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। কায়রো আগমনের এক বৎসর পর ১৯৩৪ সালে এক নিবন্ধে এ সম্পর্কে ইমাম হাসানুল বান্না লিখেন ঃ

ইখওয়ানের পয়গাম ও দর্শন মিশরের ৫০টির বেশী শহর আর নগরে ছড়িয়ে পড়েছে। এসব শহরে কেবল ইখওয়ানের শাখাই স্থাপিত হয়নি; বরং প্রতিটি স্থানে সেসব শাখার সঙ্গে কোন না কোন কল্যাণকর স্কীমও হাতে নেয়া হয়েছে। যেমন ইসমাঈলিয়ায় একটা কেন্দ্র এবং একটা মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে। একটা ক্লাবও নির্মাণ করা হয়েছে। বালকদের জন্য আলহেরা মাদ্রাসা এবং বালিকাদের জন্য উম্মাহাতুল মু'মিনীন মাদ্রাসা স্থাপন করা হয়েছে। শাবরাখীত-এ মসজিদ, ক্লাব এবং বালকদের বিদ্যালয় ছাড়াও একটা শিল্প-কারখানাও স্থাপন করা হয়েছে। যেসব ছাত্র শিক্ষা সমাপ্ত করতে পারে না, তারা এ কারখানায় যোগদান করে। মাহমূদিয়ায় একটা কাপড়ের কল এবং একটা কার্পেট কারখানাও স্থাপন করা হয়েছে। নাজেরা কুরআন শরীফ পাঠ এবং হিফ্য করার একটা মাদ্রাসাও স্থাপন করা হয়েছে। অন্যত্রও অনুরূপ শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করা হয়েছে। মোটকথা প্রতিটি স্থানীয় শাখা কিছু না কিছু কল্যাণকর স্কীম চালু করেছে। কায়রোর অভ্যন্তরে অনেক শাখা স্থাপন করা হয়েছে।

www.pathagar.com

এক সর্বাত্মক আন্দোলন

এ যাবৎ হাসানুল বান্নার আহ্বান সাধারণ সংস্কার পর্যন্ত সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ১৯৩৫ সালে তিনি সরাসরি রাজনীতিতে নেমে পড়েন। বক্তৃতা-বিবৃতি এবং রাজনৈতিক সমাবেশে সংস্কারের কথা বলেই কেবল তিনি ক্ষান্ত হননি, বরং উপর্যুপরি পত্রও প্রেরণ করেন সরকারের নিকট। পরিস্থিতির পরিবর্তনের প্রতি তিনি সরকারের দৃষ্টি আকৃষ্ট করেন। এসব পত্র থেকে জানা যায় যে, পরিস্থিতির পরিবর্তন বলতে তিনি কেবল দ্বীনী বা নৈতিক পরিবর্তনই বুঝান নি, বরং রাষ্ট্র শাসননীতি, দেশের শিক্ষা-সংস্কৃতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, দেশের আইন-কানুন, স্বরাষ্ট্র এবং পররাষ্ট্রনীতিতেও মৌলিক সংস্কার সাধন করাই তাঁর দাবী। মাহমূদ পাশার শাসনকাল থেকে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছড়িয়ে পড়া পর্যন্ত সময়কালে হাসানুল বান্না অত্যন্ত কার্যকরভাবে এবং উপদেশের ভঙ্গিতে এ ধারা অব্যাহত রাখেন। ১৯৩৮ সালে ইখওয়ানের আন্দোলন সবদিক থেকে একটা সর্বাত্মক বিপ্লবী রূপ পরিগ্রহ করে। মিশরের বাইরে গোটা আরব জাহানের দিকেদিকে ইখওয়ানের বাণী ছড়িয়ে পড়ে। তিনি ১৯৩৮ সালে ইখওয়ানের পরিচয় দিতে গিয়ে বলেন ঃ

এক সর্বাত্মক দর্শনের উপর ইখওয়ানের আন্দোলন প্রতিষ্ঠিত এবং সংস্কার-সংশোধনের সকল দিক ও বিভাগে তা বিস্তৃত। ইখওয়ান একটা সালাফী আন্দোলন। কারণ ইখওয়ান কিতাব ও সুন্নার দাবীদার। ইখওয়ান চায় ইসলাম তার স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন উৎসের দিকে ফিরে যাক। ইখওয়ান সুন্নাহর তরীকা। কারণ, সকল ক্ষেত্রে ইখওয়ান পবিত্র সুন্নাহ অনুযায়ী আমল করতে সচেষ্ট। ইখওয়ান তাসাউউফের একটা সিলসিলা। কারণ, ইখওয়ান অনুধাবন করতে পেরেছে যে, আত্মার পরিশুদ্ধি পরিপুষ্টি এবং আল্লাহর প্রতি ভালোবাসাই হচ্ছে সকল কল্যাণের উৎস। ইখওয়ান একটা রাজনৈতিক সংগঠন। কারণ, আমরা দেশের ভেতরে এবং বাইরে শাসন নীতির সংস্কার চাই। আমরা চাই জাতিকে সসম্মানে লালন করতে। ইখওয়ান একটা অনুশীলন দল। কারণ, ইখওয়ান শারীরিক কসরতের মাধ্যমে নিজেদের দৈহিক লালন করে এবং অন্যান্য খেলোয়াড় টীমের সঙ্গে ম্যাচও খেলে। ইখওয়ান একটা শিক্ষা ও সংস্কৃতি সংগঠন। কারণ, ইখওয়ানের ক্লাব ও কেন্দ্র মূলতঃ শিক্ষা-সংস্কৃতির লালন ক্ষেত্র এবং জ্ঞান ও বিবেককে চাঙ্গা করার প্রতিষ্ঠান। ইখওয়ান একটা অর্থনৈতিক কোম্পানী। কারণ ইসলাম অর্থনৈতিক বিষয়েও দিক নির্দেশনা দেয়। ইখওয়ান একটা সমাজ দর্শনের নাম। কারণ, ইখওয়ান সমাজের ব্যাধি সম্পর্কে অবগত আছে এবং উম্মতকে সেসব ব্যাধি থেকে নিরাময় করার ব্যবস্থা করে (শহীদ ইমামের রচনা সমগ্র পৃষ্ঠা ২৪৯-২৫০)।

www.pathagar.com

আন্দোলনের ব্যাপ্তি ও বিস্তৃতি

মিশরের স্বনামধন্য লেখক মুহাম্মদ শাওকী জাকী লিখেন ঃ

১৯৩৯ থেকে ১৯৪৫ সালের মধ্যে রাজনৈতিক বিবেচনায় ইখওয়ানের বাণী এক নবপর্যায়ে প্রবেশ করে। এর কর্মতৎপরতা আর কার্যধারায় অস্বাভাবিক বিস্তৃতি ঘটে। এ সময় কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় এবং আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের যুবকরা দলে দলে ইখওয়ানে প্রবেশ করে। নানা পেশা আর শ্রেণীর লোকজন, যাদের মধ্যে শ্রমিক-কৃষক, ব্যবসায়ী-শিল্পপতি, ডাক্তার-ইঞ্জিনিয়ার, শিক্ষক, আইনজীবী, পেশাজীবীসহ সর্বস্তরের লোক অন্তর্ভুক্ত ছিল- সকলেই ইখওয়ানে যোগদান করে এবং মিশরীয় সমাজের প্রায় সর্বস্তরের প্রতিনিধিত্ব করেন এরা। ইখওয়ান এক দিকে অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে অগ্রসর হয়ে অংশগ্রহণ করে এবং কর্মতৎপরতা দেখায় এবং অন্যদিকে শারীরিক কসরত এবং স্কাউটিং- এও তারা অংশ নেয়। দেশের আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে থাকা ইখওয়ানের শাখা সুচারুরূপে সকল কর্ম সম্পাদন করতে শুরু করে। তারা প্রতিটি কাজ সুশৃংখলভাবে সম্পন্ন করে। দেখতে না দেখতে ইখওয়ান এমন এক শক্তিতে পরিণত হয়, যাকে কিছুতেই উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখা যায় না (ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও মিশরীয় সমাজ-আল-ইখওয়ানুল মুসলিমুন ওয়াল মুজতামাউল মিশরী- পৃষ্ঠা ১৬)।

পরীক্ষা ও নির্যাতন

কিন্তু এ সময়টাতেই ইখওয়ানের জন্য পরীক্ষা আর বিপদের দ্বারও উন্মুক্ত হয়। ইখওয়ানের প্রথম পরীক্ষা শুরু হয় হুসাইন সিররী পাশার মন্ত্রীত্বকালে। ইখওয়ানের ক্রমবর্ধমান শক্তি দেখে বৃটিশ দূতাবাস এবং ইংরেজ কর্মকর্তারা যে কোনভাবে ইখওয়ানের সয়লাব রোধ করার জন্য মিশর সরকারের উপর চাপ সৃষ্টি করতে থাকে। তাদের চাপের মুখে সিররী পাশা ইখওয়ানের দুটি সাপ্তাহিক পত্রিকা আত তা'আরুফ (পরিচিতি) এবং আশশু'আ (আলো) বন্ধ করে দেয়। ইখওয়ানের মাসিক পত্রিকা আল-মানারও (অলোকস্তম্ভ) নিষিদ্ধ করা হয়। ইখওয়ানের ছাপাখানা বাজেয়াপ্ত করা হয় এবং ইখওয়ান সম্পর্কে কোন খবর প্রকাশ না করার জন্য দেশের সংবাদপত্রকে নির্দেশ দেয়া হয়। ইখওয়ানকে সভা-সমাবেশ করার অনুমতি দেয়া হয় না। এরপর আন্দোলনের নেতাদেরকে ছত্রভঙ্গ করার পরিকল্পনা কার্যকর করা হয়। হাসানুল বান্নাকে বদলী করা হয় কায়রো

www.pathagar.com

থেকে অন্যত্র (তিনি তখনো শিক্ষা বিভাগের চাকুরীতে নিয়োজিত ছিলেন)। ইখওয়ানের মহাসচিবকেও দিমইয়াতে বদলী করা হয়। অবশ্য পরে পার্লামেন্টের তীব্র প্রতিবাদের মুখে তাকে পুনরায় কায়রোয় ফেরৎ আনা হয়। কিন্তু কায়রো পৌঁছা মাত্রই তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়। অবশ্য পরিস্থিতি নাজুক দেখে কিছুদিন পর তাকে মুক্তি দেয়া হয়। নাহাস পাশা মন্ত্রীসভা গঠন করলে তিনি ইখওয়ান সম্পর্কে নমনীয় নীতি অবলম্বন করেন। ১৯৪৪ সালে নাহাস পাশার মন্ত্রীসভা ভেঙ্গে দেয়া হলে আহমদ মাহের পাশা মন্ত্রীসভা গঠন করেন। তিনি পুনরায় ইখওয়ানের উপর কড়াকড়ি আরোপ করেন। ইংরেজদের চাপের মুখে তিনি জার্মানী এবং ইটালীর বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের কথা ঘোষণা করেন। ইখওয়ান এ সিদ্ধান্তের বিরোধিতা করে। তারা আহমদ মাহেরের নিকট এ সিদ্ধান্ত বাতিল করার দাবী জানায়। এ সময় জনৈক ব্যক্তি হামলা চালিয়ে আহমদ মাহেরকে হত্যা করে। এরপর সরকার গঠন করেন নোকরাশী পাশা। হাসানুল বান্না, ইখওয়ানের মহাসচিব এবং অন্যান্য নেতৃবৃন্দের গ্রেফতারের মধ্য দিয়েই শুরু হয় নোকরাশী পাশার শাসনকাল।

সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ বিরোধী তীব্র আন্দোলন

১৯৪৫ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অবসান ঘটলে ইখওয়ান নবতর এক কঠিন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়। যুদ্ধকালে ইংরেজরা মিশরকে প্রতিশ্রুতি দেয় যে, যুদ্ধে তারা ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিলে যুদ্ধ শেষে বৃটেন মিশরকে স্বাধীনতা দান করবে। যুদ্ধ শেষ হলে ইখওয়ান সারা দেশে এক ব্যাপক গণআন্দোলন শুরু করে এবং প্রতিশ্রুতি পূরণ করার জন্য ইংরেজদের নিকট দাবী জানায়। অপরদিকে নতুন পরিস্থিতি মুকাবিলা করার জন্য দলকে নবপর্যায়ে সুসংগঠিত করা শুরু করে। ১৯৪৫ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর ইখওয়ানের জেনারেল কাউন্সিলের অধিবেশন ডাকা হয়। এই অধিবেশনে নতুন পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে দলীয় গঠনতন্ত্রে প্রয়োজনীয় সংশোধন করা হয়। এ সময় নতুন বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান খোলা হয়। যার ফলে আয় বৃদ্ধি পায় এবং শ্রমিক শ্রেণীর মধ্যেও দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পায়। তারা 'আল ইখওয়ান' নামে এক নতুন দৈনিক সংবাদপত্রও বের করে, যার প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৪৬ সালের ৫ই মে। অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন গড়ে তোলা হয়। সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের জন্য স্থানে স্থানে গণকেন্দ্রও খোলা হয়। মিশর এবং অন্যান্য আরব দেশের জনগণকে তারা সুসংগঠিত করে তোলে। দলের অভ্যন্তরে কর্ম বন্টনের নীতি অবলম্বন করা হয়। ইখওয়ান সদস্যরা তাদের মুর্শিদ হাসানুল বান্নার হাতে নবপর্যায়ে বায়য়াত গ্রহণ করে এবং তাঁকে আজীবন

www.pathagar.com

নেতা হিসাবে নির্বাচিত করে। এ সময় দলের যে উন্নতি সাধিত হয়, সে সম্পর্কে মুহাম্মদ শাওকী জাকী বলেন ঃ

কেবল মিশরের অভ্যন্তরেই ইখওয়ানের সক্রিয় কর্মির সংখ্যা ৫ লাখে পৌঁছে। আর সহায়ক-সমর্থক এবং পৃষ্ঠপোষকের সংখ্যা ছিল এর চেয়ে কয়েক গুণ বেশী। এ সময় মিশরের অভ্যন্তরে ইখওয়ানের শাখার সংখ্যা ছিল ২ হাজার। সুদানেও ৫০টি শাখা স্থাপন করা হয়। অন্যান্য আরব দেশেও অনেক শাখা খোলা হয় (ইখওয়ানুল মুসলিমুন ও মিশরীয় সমাজ পৃষ্ঠা ২১)।

ফিলিস্তীন যুদ্ধে ইখওয়ানের অংশগ্রহণ

নোকরাশী পাশার শাসনামলে হাসানুল বান্না ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করেন। এ সময় তিনি সারা দেশে আজাদীর আগুন জ্বালিয়ে দেন। নোকরাশী পাশার সরকার এ আন্দোলনের মোকাবিলা করতে না পেরে পদত্যাগ করে। ইসমাঈল সেদকী পাশা সরকার গঠন করেন। ইনিও ইখওয়ানের উপর কঠোরতর আঘাত হানেন এবং শুরু করেন ব্যাপক ধরপাকড়। অবশেষে ইসমাঈল সেদকী পাশাকেও পদত্যাগ করতে হয়। পুনরায় নোকরাশী পাশা ক্ষমতা গ্রহণ এবং ১৯৪৬ সালের ১০ই সেপ্টেম্বর মন্ত্রীসভা গঠন করেন। একদিকে ছিল ইখওয়ানের জিহাদ ও আজাদী আন্দোলন। আর অন্যদিকে ছিল নোকরাশী পাশা ও ইংরেজ। উভয়পক্ষের মধ্যে দ্বন্দ্ব চলতে থাকে। এ দ্বন্দ্বে ফিলিস্তীন সমস্যায় আরো তিক্ততা সৃষ্টি করে। ফিলিস্তীন সমস্যার ব্যাপারে ইখওয়ান ছিল অন্যদের চেয়ে অগ্রসর। একদিকে ফিলিস্তীন সমস্যা সম্পর্কে তাঁর ভূমিকা প্রভাব-প্রতিপত্তি বৃদ্ধি করে। অন্যদিকে মিশরের ভেতরে এবং বাইরে তাঁর জনপ্রিয়তাও বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। ১৯৪৭ সালের ১২ই ডিসেম্বর ইখওয়ান এক বিশাল প্রতিবাদ মিছিল বের করে। আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর থেকে এ মিছিল বের হয়। ইমাম হাসানুল বান্না নিজে এই মিছিলের নেতৃত্ব দেন। তিনি মোটর গাড়ীতে বসে মাইকযোগে নির্দেশ দেন। ১৯৪৮ সালের ৬ই মে ইখওয়ানের শীর্ষ পরিষদের বৈঠক বসে। এতে ইসরাইলের বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করে ফিলিস্তীনকে রক্ষা করার সম্ভাব্য সকল উপায় অবলম্বন করার জন্য মিশর এবং অন্যান্য আরব সরকারের নিকট জোর দাবী জানানো হয়।

ইখওয়ান অন্যদের অপেক্ষা না করে নিজেদের হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী ফিলিস্তীনে প্রেরণ করে। ইখওয়ান স্বেচ্ছাসেবীরা এ যুদ্ধে এমন বীরত্ব প্রদর্শন

www.pathagar.com

করে, এ সব বিস্ময়কর কীর্তি স্থাপন করে, যা দেখে ইংরেজ এবং ইহুদীরা প্রমাদ গনে। এ পরিস্থিতি দেখে নোকরাশী পাশা ভীষণ বিচলিত হয়ে পড়েন। 'মোল্লাদের' ক্রমবর্ধমান প্রভাব দেখে রাজা ফারুকও ছটফট শুরু করেন। কতিপয় বিদেশী দূতাবাসের কূটনীতিকরা মিশরে বৃটিশ সৈন্যের সামরিক ঘাঁটি 'ফায়েদ'-এ এক সম্মেলনে মিলিত হয়ে সকলে একমত হয়ে ইখওয়ানকে বেআইনী ঘোষণা করার জন্য নোকরাশী পাশার নিকট দাবী জানান। তখন ইখওয়ান ছিল ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত। হাসানুল বান্না একের পর এক স্বেচ্ছাসেবী বাহিনী সংগঠিত করে জিহাদে প্রেরণ করছিলেন। কিন্তু নোকরাশী পাশা তাঁর প্রভুদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য ১৯৪৮ সালের ৮ই ডিসেম্বর জরুরী আইনের ৭৩ ধারা বলে ইখওয়ানকে বেআইনী ঘোষণা করেন।

এ পদক্ষেপের পর গোটা মিশরে ইখওয়ানের উপর নির্যাতন নেমে আসে। দলের সমস্ত কেন্দ্র এবং দফতর বন্ধ করে দেয়া হয়। হাজার হাজার শিক্ষিত যুবককে কারাগারে নিক্ষেপ করা হয়। তাদের উপর এমন পাশবিক নির্যাতন চালানো হয়, যা শ্রবণ করলে গায়ে শিহরণ ধরে। এহেন গোলযোগ কালে জনৈক যুবকের হাতে স্বয়ং নোকরাশী পাশাও নিহত হয়। অতঃপর মন্ত্রীত্বের গদীতে বসেন ইবরাহীম আবদুল হাদী পাশা। ইনি অসম্পূর্ণ কাজটিও সম্পূর্ণ করেন। তাঁর শাসনামলে ১৯৪৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী প্রকাশ্য রাজপথে শুব্বানুল মুসলিমীনের দফতরের সম্মুখে সত্য ও ন্যায়ের মূর্ত প্রতীক, পর্বতবৎ দৃঢ়চেতা, মহান দ্বীনের মশালবাহী এবং ঈমান ও একীনের মহান দায়ী ইমাম হাসানুল বান্নাকে গুলি করে হত্যা করা হয়। তাঁকে হত্যা করে ইংরেজ, ইহুদী এবং ইসলামের দুশমনরা পরম উল্লাসে মেতে উঠে।

হাসানুল বান্নার শাহাদাত

হাসানুল বান্নার জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করলে দেখা যায়, শৈশব থেকে জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত যে সময়টা তিনি অতিবাহিত করেছেন, তাতে শান্তি আর বিশ্রামের সময় ছিল নিতান্তই কম। তাঁর অধিকাংশ সময় অতিবাহিত হয়েছে কর্মতৎপরতার মধ্য দিয়েই। আমাদের কাছে মনে হবে যেন সদা কর্মতৎপর এ মানুষটি শান্তি-স্বস্তির সঙ্গে পরিচিতই ছিলেন না। তাঁর জীবনের দিনগুলো ব্যয় হতো ইসলামের প্রচার-প্রসার আর মানুষের খেদমতে আর রাত্রি ওয়াকফ ছিল আল্লাহর দরবারে হাজিরী আর কান্নাকাটির জন্য। ১৯০৬ সালের অক্টোবর মাসে

www.pathagar.com

তিনি জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৯৪৯ সালের ১২ই ফেব্রুয়ারী কায়রোর রাজপথে তাঁকে শহীদ করা হয়। এ হিসাবে তাঁর বয়স ছিল ৪৩ বৎসরের কাছাকাছি। এ সংক্ষিপ্ত সময়ে তিনি এক বিরাট আন্দোলন গড়ে তোলেন এবং তাকে এতটা উন্নত করেন যে, তা আরব জাহানের সবচেয়ে বড় ইসলামী আন্দোলন হিসাবে পরিচিতি লাভ করে। এ আন্দোলন চিন্তা আর কর্মের ক্ষেত্রে এত বিরাট বিপ্লব সাধন করেছে যে, অদ্যাবধি তার প্রভাব ম্লান করা সম্ভব হয়নি। বয়স আর কর্মের তুলনা করলে বয়সের স্বল্পতা আর কর্মের ব্যাপ্তি দেখে এ কথা না বলে উপায় নেই যে, হাসানুল বান্না আল্লাহর এক বিশেষ দানের নাম। তাঁর দুনিয়ার জীবনের এক একটা ঘন্টা কয়েক বৎসরের চেয়েও বেশী মূল্যবান ছিল। তাঁর অসীম নিষ্ঠা-আন্তরিকতা আর অপরিসীম আত্মিক শক্তির বদৌলতে আল্লাহ তাঁকে এ বৈশিষ্ট্যমন্ডিত করেছিলেন। তাঁর জীবনের প্রতিটি নিঃশ্বাসে এ বৈশিষ্ট্যের পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর শাহাদাতের ঘটনা প্রসঙ্গে মিশরের স্বনামধন্য আলেমে দ্বীন শায়খ মুহাম্মদ গাজালী মন্তব্য করেন ঃ

আততায়ীর গুলি এমন দেহ বিদীর্ণ করেছে, যে দেহ বিনয় আর দীনতা সহকারে আল্লাহর হুজুরে ইবাদাতে ইবাদাতে নিয়োজিত থেকে এমনিতেই নেতিয়ে পড়েছিল। দীর্ঘ সময় নামাযে দন্ডায়মান আর সিজদায় রত থাকার কারণে অতিশয় জীর্ণশীর্ণ হয়ে পড়েছিল। আল্লাহর রাস্তায় অব্যাহত সফরের কারণে তাঁর শরীর ভেঙে পড়েছিল। নিরবচ্ছিন্ন সফরের লক্ষণ তাঁর চেহারা থেকেই পরিস্ফুট হতো। আরাম-আয়েশের সঙ্গে অপরিচিত এমন দেহের উপর গুলি চালিয়ে আততায়ী যে ক্ষমাহীন অপরাধ করেছে, তার নিন্দা করার কোন ভাষা আমাদের জানা নেই। অবশ্য সে দেহের জন্য এই গুলি এক চিরন্তন স্বস্তির পয়গাম বয়ে এনেছে। এ এমন এক চিরন্তন শান্তি, যার সম্পর্কে আল্লাহর নবী বলেছেন ঃ

মু'মিন বান্দাহ যখন দুনিয়া থেকে বিদায় নেয়, তখন সে কষ্ট-ক্লেশ থেকে মুক্তি পেয়ে শান্তি-স্বস্তির জগতে স্থানান্তরিত হয়।

হাসানুল বান্নার জীবনের মূল্যায়ন

১৯০৬ সালে মিশরের অন্তপাতী গ্রামের এক কৃষক পরিবারে হাসানুল বান্নার জন্ম। আর ১৯৪৯ সালে কায়রোর রাজপথে তিনি শহীদ হন। তাঁকে হত্যা করার জন্য ইংরেজ, ইহুদী, মিশরের পুতুল সরকার এবং বাদশাহ ফারুক- সকলকে

www.pathagar.com

মিলে ষড়যন্ত্র পাকাতে হয়। তাঁর জীবনের আয়ুস্কাল দাঁড়ায় ৪৩ বৎসরের মতো। ১৯২৮ সালে ইখওয়ানুল মুসলিমূন প্রতিষ্ঠিত হয়। যেন এই মহান সাধক পুরুষ মাত্র ২০ বৎসর সময়ের মধ্যে এমন এক আন্দোলন গড়ে তোলেন, যা ইতিহাসের গতিধারা পরিবর্তন করে দিয়েছে। জাহেলিয়াতের কোলে আশ্রয় নেয়া জাতিকে তিনি পুনরায় ইসলামের পথে ফিরায়ে আনেন। নাস্তিক্যবাদ আর জড়বাদের খপ্পরে পড়ে হাবুডুবু খাওয়া যুবসমাজ, স্বাদেশিকতা, জাতীয়তাবাদ এবং অন্যান্য জাহেলী চিন্তাধারায় যারা ছিল পতাকাবাহী, এ আন্দোলনের বদৌলতে তাদের এমন রূপান্তর ঘটেছে যে, এখন তাদের মুখে ধ্বনি শোনা যায় ঃ

আল্লাহর সন্তুষ্টি আমাদের চরম লক্ষ্য, الله غايتنا *রাসূল (দঃ) আমাদের নেতা,* الرسول زعيمنا *আল কুরআন আমাদের সংবিধান,* القران دستورنا *জিহাদ আমাদের পথ,* الجهاد سبيلنا *আল্লাহর পথে মৃত্যু আমাদের পরম কাম্য।* الموت في سبيل الله اسمي امانينا

মাত্র ২০ বৎসর সময়ের মধ্যে এমন মানসিক পরিবর্তন সাধন করা এমন ব্যক্তির কাজ হতে পারে, আল্লাহ যাকে অস্বাভাবিক যোগ্যতা দিয়ে দুনিয়ায় প্রেরণ করেছেন।

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য

এখানে আমরা ইমাম হাসানুল বান্নার চরিত্র, বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করবো, যিনি এক বিশাল জনগোষ্ঠীকে আকৃষ্ট করতে সক্ষম হয়েছিলেন। আবদুর রহমান আল বান্না ছিলেন তাঁর ছোট ভাই। উভয়ের মধ্যে বয়সের ব্যবধান ছিল মাত্র দু'বৎসরের। শিক্ষা-দীক্ষা আর ইসলামী আন্দোলনের ক্ষেত্রে উভয়ে একসঙ্গে কাজ করার দীর্ঘ সুযোগ পেয়েছেন। আবদুর রহমান আল-বান্না লিখেন ঃ শৈশব থেকেই হাসানুল বান্নার মধ্যে নামায-রোযা এবং আল্লাহর যিকরের প্রতি প্রবল আকর্ষণ ছিল। আমরা উভয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের পার্শ্ববর্তী ছোট মসজিদে গমন করতাম এবং এশার নামাযের পর হোছাফী ইখওয়ানদের যিকরের মজলিশে যোগ দিতাম। এখানে দীর্ঘক্ষণ আমরা সকলের সঙ্গে আল্লাহর যিকরে মশগুল থাকতাম। তখন মসজিদে যিকরকারী ছাড়া অন্য কেউ থাকতো না। রজনী নিথর-নিস্তব্ধ হয়ে আসতো। কেবল দোয়া আর মুনাজাতের প্রচ্ছন্ন আওয়াজ কানে ভেসে আসতো। হাসানুল বান্নার কণ্ঠে এ কবিতা বারবার শোনা যেতো ঃ

www.pathagar.com

আল্লাহকে ডাক, আর অন্যসবকে ত্যাগ কর,
যদি ব্যাকুল হও পূর্ণতার স্তরে উপনীত হতে।
ভালোভাবে চিন্তা করলে জানতে পারবে
আল্লাহ ছাড়া সবকিছুই অস্তিত্বহীন,
সংক্ষেপেও, আর সবিস্তারেও।

ফকীর দরবেশ আর নেককারদের প্রতি হাসানুল বান্নার ছিল অগাধ ভালোবাসা। শৈশবকাল থেকেই তিনি এমন লোকদের সংসর্গে গমন করতেন। একটা কবিতার মাধ্যমে বন্ধুদের কাছে তিনি এ আকাঙ্খা ব্যক্ত করতেন ঃ

- কী সে জীবনের স্বাদ ফকীরদের সংসর্গ বিহনে!
এরাই বাদশা, এরাই নেতা, এরাই কর্তা।
এ প্রসঙ্গে আল্লামা ইকবাল বলেন ঃ

- অন্তরে যদি আকাঙ্খা থাকে খেদমত কর ফকীরদের,
এ রত্ন পাওয়া যায় না বাদশাহদের ধনভান্ডারে!

তাঁর স্বভাব-প্রকৃতিতে ছিল ভীষণ ঐশ্চর্য। ইখওয়ানের কর্মপরিষদের সদস্য আমীন ইসমাঈল সফরে-পরিভ্রমণে তাঁর সঙ্গে থাকতেন। তিনি নিজের প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে লিখেন ঃ

তাঁর ঐশ্বর্য আর উদারচিত্ততার শান এমন ছিল যে, একবার তিনি আমাকে এক দর্জীর নিকট নিয়ে যান। এ দর্জীর নিকট তিনি কাপড় সেলাই করতে দিয়েছিলেন। আমরা দু'জন এক সংকীর্ণ গলীতে প্রবেশ করি। দরজী আমাদেরকে দেখামাত্রই উঠে দাঁড়ায় এবং প্রথাগত স্বাগতমের অভিনয় ছাড়াই জামা এনে দেয় এবং তিন মিশরী পাউন্ড মজুরী দাবী করে। ইমাম তাকে পাঁচ পাউন্ড দিয়ে জামা নিয়ে আসেন। দরজীর নিকট থেকে অতিরিক্ত মুদ্রা ফেরৎ নেয়ার জন্য আমি চাপাচাপি করলে ইমাম আমাকে টেনে নিয়ে আসেন। আমি বুঝতে পারলাম যে, তিনি এ টাকা ফেরৎ নিতে চান না। সামনে এগিয়ে গেলে একজন অসহায় ভিক্ষুক দেখতে পান। তাকে এক রিয়াল দেয়ার জন্য ইমাম আমাকে বললেন। আমি বুঝতে পারলাম ইমামের নিকট কেবল পাঁচ পাউন্ড ছিল, যা তিনি সে দরজীকে দিয়ে দিয়েছেন। এখন তাঁর হাতে কিছুই নেই। চিত্তের এ ঐশ্বর্য ও উদারতা

www.pathagar.com

জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গী ছিল।

(শহীদ ইমাম হাসানুল বান্না পৃষ্ঠা-১০১)।

৷ দুনিয়া পূজার প্রতি ঘৃণা এবং চরিত্রের দৃঢ়তা

একজন নামকরা ইখওয়ান নেতা বাহী আল খাওলী লিখেন ঃ ১৯৩২ সালের কথা। মাত্র কয় বৎসর হলো ইখওয়ান প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ সময় ইমামকে এক উচ্চ সরকারী পদে নিয়োগ করার প্রস্তাব দেওয়া হয়। উদ্দেশ্য ছিল তাঁকে আল্লাহর দিকে আহ্বানের কাজ থেকে সরিয়ে নেয়া। কিন্তু ইমাম প্রস্তাবককে এমন কার্যকর জবাব দিলেন, যাতে লজ্জায় তার মাটিতে লুটে পড়ার উপক্রম। তিনি সেদিন ঐ প্রস্তাব গ্রহণ করলে আজ তাঁর সন্তানরা এমন অবস্থায় থাকতো, যা দেখে অন্যদের হিংসা জাগতো। কিন্তু হাসানুল বান্না দুনিয়া পূজার পথ প্রত্যাখ্যান করেছেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ সবেমাত্র শুরু হয়েছে। এ সময় ইংরেজরা ইমামকে কয়েক হাজার পাউন্ড দেয়ার প্রস্তাব দেয়। বরং এতটুকুও বলে দেয়া হয় যে, হাসানুল বান্নার ইঙ্গিতে ইংরেজদের ধনভান্ডার উজাড় করে দেয়া হবে। কিন্তু দুনিয়াত্যাগী এ মানুষটি ইংরেজদের প্রেরণ করা যুবককে ঘর থেকে বের করে দেন কঠোর জবাব দিয়ে। আসলে তারা চেয়েছিল ইমামের ঈমান ও বিবেক খরীদ করতে। ব্যর্থ ও হতাশ হয়ে তারা বুঝতে পেরেছে যে, স্বর্ণ-রৌপ্য দ্বারা এ লোকটাকে ক্রয় করা যাবে না।

ইখওয়ানুল মুসলিমূন দেশে বিপুলসংখ্যক কোম্পানী প্রতিষ্ঠা করেছে। ইমাম ছিলেন সমস্ত কোম্পানীর পরিচালনা বোর্ডের সদস্য। কোম্পানীর কাজে তাঁকে সময় দিতে হতো, ভীষণ পরিশ্রম করতে হতো। ইখওয়ান বারবার এ শ্রমের বিনিময় দিতে চেয়েছে। এমনকি মাসিক ভাতা নির্ধারণ করারও চেষ্টা করেছে। কিন্তু তিনি কিছুই গ্রহণ করতে রাজী হননি। বরং তিনি বলেছেন, মানুষের নিকট থেকে নয়, আল্লাহর নিকট থেকে আমি বিনিময় গ্রহণ করবো। অর্থনীতি আর কাজ কারবারের ক্ষেত্রে এটা এক বিরল দৃষ্টান্ত (শহীদ ইমাম পৃষ্ঠা ১২২)।

দুশমনদের পক্ষ থেকে ইমাম আল বান্নার উপর নানা ধরনের অভিযোগ উত্থাপন করা হয়েছে। বলা হয়েছে, লোকটি ভাড়াটিয়া এজেন্ট, লোকটি উৎকোচ গ্রহণ করে। লোকটি হাজার হাজার পাউন্ডের বৈদেশিক সাহায্য গ্রহণ করে। তার কয়েকখানা গাড়ী আছে। অসংখ্য কোম্পানীতে তিনি পুঁজি বিনিয়োগ করেছেন। সেখান থেকে নির্ধারিত অংশ পান। এসব কিছুই বলা হয়েছে। অভিযোগকারীরা

www.pathagar.com

যখন তাকে প্রকাশ্যে হত্যা করেছে, তখন বিশ্ব জানতে পেরেছে যে, লোকটি ছিল এতই নিঃসম্বল যে, কায়রোয় তাঁর নিজের থাকার জায়গাও ছিল না। বরং একটা পুরাতন ধাঁচের মহল্লায় জীর্ণশীর্ণ ভাড়া বাড়ীতে তিনি থাকতেন। তাঁর এ বাড়ীর ভাড়া ছিল মাসিক এক পাউন্ড ৮০ ক্রোশ। শাহাদাতের পর তাঁর সন্তানরা আয় উপার্জন থেকে সম্পূর্ণ বঞ্চিত হয়ে পড়েছিল (শহীদ ইমাম পৃষ্ঠা ৭৬-৭৭)।

উন্নত স্বভাবের মূর্ত প্রতীক

ফিলিস্তিনের প্রধান মুফতী আলহাজ আমীন আল হোসাইনী বলেন ঃ ১৯৪৬ সালে ইউরোপ থেকে মিশর গমন করলে আমি প্রথমবারের মতো তাঁকে স্বচক্ষে দেখতে পাই। আমি তাঁর কথাও শুনেছি। আমি তাঁর মধ্যে স্বচ্ছ-পরিচ্ছন্ন রুহ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছি। পরে আমাদের সম্পর্ক অনেক গভীর হয়েছিল। আমার কাছে প্রতিভাত হয়েছে যে, এ মহান ব্যক্তিকে আল্লাহ্ তা'আলা অনেক বিরল গুণাবলী, উন্নত স্বভাব-চরিত্র আর মহৎ বৈশিষ্ট্যে বিভূষিত করেছিলেন। তাঁর উল্লেখযোগ্য গুণাবলী ছিল গভীর নিষ্ঠা-আন্তরিকতা, সুস্থ বিবেক-বুদ্ধি আর শক্তিশালী দৃঢ়তা। তাঁর সুদৃঢ় বিশ্বাস আর মোহাম্মদী আখলাক এ তিনটি গুণকে সুশোভিত করেছিল। তিনি ছিলেন উন্নত সাহস আর আত্মবিসর্জনকারী মানুষ। আত্মস্বার্থ বিসর্জন, চরিত্রের দৃঢ়তা, সরলতা ও সাধুতা, বস্তুগত স্বার্থ থেকে দূরে থাকা এবং পুত-পবিত্র স্বভাবে তিনি বিভূষিত ছিলেন। এগুলো ছিল সেসব গুণাবলী, যার বদৌলতে তিনি নেতৃত্বের মহান পদে বরিত হয়েছিলেন। আমি তাঁর বাসায়ও গমন করেছি। গৃহের আসবাবপত্র ছিল নিতান্তই মামুলী এবং ঘরের সব কিছুই অল্পে তুষ্টি আর টানাটানির ইঙ্গিত দিচ্ছিল।

বিনয়ী স্বভাব

আমার মনে পড়ে, এক নিমন্ত্রণে তাঁর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়। আরব লীগের সাবেক সেক্রেটারী জেনারেল আবদুর রহমান আযযাম কায়েদে আযম মুহাম্মদ আলী জিন্নাহ্র সম্মানে এ নিমন্ত্রণের আয়োজন করেন। কায়েদে আযমের সঙ্গে ছিলেন মরহুম লিয়াকত আলী খানও। মেজবানের বাসভবনে সর্বপ্রথম উপস্থিত হই আমি এবং মরহুম শহীদ হাসানুল বান্না। আমরা উভয়ে পাকিস্তানী নেতৃদ্বয়ের সঙ্গে দীর্ঘক্ষণ আলোচনা করি। এরপর এক এক করে অন্যান্য নিমন্ত্রিত

www.pathagar.com

অতিথিরাও আগমন করেন। আমি দেখতে পেয়েছি, কোন নতুন মেহমান আগমন করলে শহীদ হাসানুল বান্না নিজের আসন ত্যাগ করে পেছনে সরে যেতেন। এমনকি তিনি পেছনে হটতে হটতে একেবারে দরজার নিকটের আসনে গিয়ে বসেন। মেহমানদের আগমনের পালা শেষ হলে মেজবান আবদুর রহমান আযযাম উপস্থিত সকলের প্রতি আবেদন জানান খাবার ঘরে গমন করার জন্য। শহীদ মরহুম শেষ আসনে বসার কারণে খাবার ঘরের নিকটে ছিলেন। আযযাম তাঁর প্রতি খাবার ঘরে গমন করার আবেদন জানান। কিন্তু তিনি অন্যান্য মেহমানদেরকে অগ্রাধিকার দিয়ে নিজে পেছনে খেতে যান। সকলের শেষে খাবার ঘরে যিনি গমন করেন, তিনি ছিলেন হাসানুল বান্না। আমি এ দৃশ্য অবলোকন করতে থাকি। আমার বিশ্বাস জন্মেছে যে, ইনি নিতান্ত বিনয়ী এবং মহৎ গুণের অধিকারী। এ ছাড়াও তিনি সমস্যা সমাধানে অস্বাভাবিক নমনীয়তা প্রদর্শন করতেন। তাঁর কথা মনে পড়লে অকস্মাৎ আমার মনের কোণে এ কবিতা ভেসে উঠে।

- হায়, যুগ যদি তাঁর মতো ব্যক্তিত্ব আমাদেরকে দান করতো। কিন্তু এমন ব্যক্তি সৃষ্টিতে যুগ বড়ই কৃপণ! (শহীদ ইমাম পৃষ্ঠা ১২৩-১২৯)।

মরহুম শহীদের সাধারণ জীবনধারা এবং বাচনভঙ্গি প্রসঙ্গে আবদুর রহমান আল বান্না লিখেন ঃ নীচে বসার ব্যবস্থা হলে মরহুম শহীদ চাটাইয়ের উপর বসতেন এবং সকলের পেছনে বসতে পছন্দ করতেন। সেখানে তাঁকে চেনার অন্য কোন উপায় থাকতো না। অবশ্য তাঁর চেহারা থেকে জ্ঞানের দীপ্তি আর নূরের আভা ফুটে উঠতো। সাধারণতঃ তিনি সস্তা দামের লম্বা জামা পরিধান করতেন, যা ছিল আরবদের সাধারণ পোশাক। জামার উপরে আবা গায়ে দিতেন। মাথায় পাগড়ি বাঁধতেন। তার চেহারা ছিল উজ্জ্বল গৌরবর্ণের। চেহারা থেকে নূরের আভা ফুটে উঠতো। কথাবার্তায় তিনি কৃত্রিমতা দেখাতেন না। সাদা সিধা এবং প্রচলিত ভাষা ব্যবহার করতেন। কথায় কথায় তিনি কুরআন মজীদের আয়াত প্রমাণ হিসাবে উল্লেখ করতেন। কুরআন মজীদ তাঁর ভালোভাবে মুখস্ত ছিল আর নিতান্ত আবেগ আপ্লুত হয়ে তিনি কুরআন মজীদ তেলাওয়াত করতেন।

পছন্দ অপছন্দের মানদণ্ড

বাহী আল খাওলী লিখেন ঃ

www.pathagar.com

হাসানুল বান্নার দরবেশীর অবস্থা এমন ছিল যে, খাবার জন্য যা কিছু মিলতো খেয়ে নিতেন, আর পরার জন্য যা কিছু জুটতো, তাই পরিধান করতেন। তাঁর বাসা ছিল নিতান্ত সাদামাটা। তাঁর জীবন ছিল যা পাওয়া যায়, তাতেই তুষ্ট। সন্তানদের জন্য কি রেখে যাচ্ছেন, তা নিয়ে তিনি কখনো ভাবেননি। মানুষের সম্মুখে সত্য কথা ব্যক্ত করা- কেবল এতেই তাঁর চক্ষু শীতল হতো, অন্তর হতো তৃপ্ত।

ভালোবাসার দূত

তিনি ছিলেন এক উদার মনের অধিকারী ব্যক্তি। ভালোবাসা আর সম্প্রীতি প্রচার করা ছিল তাঁর মিশন। একবার তিনি সফরে গমন করেন। একদল খৃষ্টান পাদ্রী তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসে। সঙ্গে রয়েছে অনেক ভক্তবৃন্দ। হযরত ঈসা (আঃ) এবং হযরত মারইয়াম প্রসঙ্গে আলোচনা হয়। তিনি এতদসংক্রান্ত কুরআন মজীদের আয়াত পাঠ করে তা ব্যাখ্যা করেন। খৃষ্টানরা মনে করে, এ সমাবেশ যেন তাদের জন্যই করা হয়েছে। কারণ, এতে মুসলমানদের কোন প্রসঙ্গ স্থান পায়নি। এ ধারা খৃস্টানদের মনে গভীর রেখাপাত করে। কারণ সাধারণ আলেমরা কিবর্তীদের বিরুদ্ধে সর্বদা বিদ্বেষপূর্ণ রীতি অবলম্বন করতেন।

সহকর্মীদের সঙ্গে ব্যবহার

দফতরের সহকর্মীদের সঙ্গে তিনি এমন মধুর ব্যবহার করতেন, যার ফলে তাঁর প্রতিটি কথা সঙ্গীদের অন্তরে ভালোবাসা সৃষ্টি করতো। ঘরে-বাইরে তাঁর সফরসঙ্গী আমীন ইসমাঈল বলেন ঃ

দফতরে তিনি আমার কার্য পুনঃনিরীক্ষণ করতেন এবং উদার মনে আমার ভুল সংশোধন করে দিতেন। আমার দ্বারা যে কোন ভুল হয়েছে, তা আমি বুঝতেই পারতাম না। বরং আমি অনুভব করতাম যে, তিনি যা বলছেন, তা-ই ঠিক। আমার কাজ আমাকে ফেরত দিতে গিয়ে স্নেহের সঙ্গে বলতেন, আমার সংশোধন করা কাজটা আর একবার দেখে নেবে। কোন বিয়োগ-সংযোগ করতে চাইলে করবে। কিন্তু আমি শপথ করে বলতে পারি যে, তাঁর সংশোধনের পর সংযোজন-বিয়োজন আমি কখনো করিনি (শহীদ ইমাম পৃষ্ঠা-১০০)।

আমার গৃহে নতুন শিশুর আগমন হলে তিনি দেখতে আসতেন। আমি অসুস্থ

www.pathagar.com

হলে তিনি আমার সেবা করতেন। আমার কোন কষ্ট হলে বাসায় এসে আমাকে সান্ত্বনা দিতেন। অথচঃ আমি অফিসের একজন সাধারণ কেরানী আর তিনি অতি ব্যস্ত মানুষ। তিনি খুব স্বল্প সময় ঘুমাতেন এবং দু'বেলা কয়েক লোকমা আহার করেই কাটাতেন।

সফরকালে দলের কর্মীদের সঙ্গে মিলিত হলে এক এক করে সকলকে সালাম করতেন। নাম উচ্চারণ করে তাদের সন্তানদের কুশল জিজ্ঞেস করতেন, তাদের পড়ালেখা সম্পর্কে খোঁজখবর নিতেন। বরং আমি তো এটাও দেখেছি যে, তিনি কৃষকদের সঙ্গেও একান্তে কথা বলতেন এবং তাদের পশুরও খোঁজখবর নিতেন। তাঁর স্মৃতি শক্তি ছিল খুব প্রখর। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ও তাঁর মনে থাকতো।

তাঁর সঙ্গে আমি খোলামেলা আলাপ করতাম। একবার আমি তাঁকে বললাম, মুহতারাম ওস্তাদ! আল্লাহ এখনো আমাকে ক্ষমা করেননি। এখনো তিনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হননি। এর প্রমাণ এই যে, আমি সারা রাত চেষ্টা করেও কালামে পাকের একটা পৃষ্ঠা মুখস্ত করতে পারি না। অর্থাৎ আমি আল্লাহর তাওফীক থেকে বঞ্চিত রয়ে গেছি। আমাকে অস্থির-বিচলিত দেখে তিনি গায়ে হাত বুলান, আমার চোখের পানি মুছে দেন। বলেন, কোন বান্দা যখন আল্লাহর সন্তুষ্টি কামনায় চোখের পানি প্রবাহিত করে, তখন আল্লাহ তাকে ক্ষমা থেকে বঞ্চিত করেন না। কুরআন মজীদ মুখস্ত করা নিয়ে বিচলিত হওয়ার কোন কারণ নেই। হযরত ওমর (রাঃ)-এরও গোটা কুরআন শরীফ মুখস্ত ছিল না। তাঁর জবাব শুনে আমি মনে সান্ত্বনা পাই।

একবার আমার দ্বারা একটা ভুল হয়ে যায়। আমি তাঁর নিকট উপস্থিত হয়ে ভুল করার কথা স্বীকার করি। কিন্তু তিনি অন্য কোন কথা জুড়ে দেন। আমি বারবার আলোচ্য বিষয়ে ফিরে যাওয়ার চেষ্টা করি; কিন্তু তিনি আমাকে কোন জবাব দেন না। তাঁর চেহারায়ও ক্ষোভের কোন লক্ষণ আমি দেখতে পাই না। এরপর আমি তাঁর সঙ্গে একান্তে দেখা করা ত্যাগ করি। একদিন অকস্মাৎ তিনি আমাকে তাঁর কক্ষে ডেকে পাঠান। আমাকে দেখেই আমার হস্ত ধারণপূর্বক বলেন, আসুন, আমরা শপথ নবায়ন করি। আমি তাঁর হাতে হাত রেখে আল্লাহ ও রাসূলের সঙ্গে অঙ্গীকার রক্ষার শপথ নবায়ন করি। অতপর তিনি বললেন, আমি শৃঙ্খলা পরিষদের সদস্য হিসাবে তোমার নাম প্রস্তাব করেছি (শহীদ ইমাম পৃষ্ঠা ৯৯-১০১)।

www.pathagar.com

◆ নেতৃত্বের বৈশিষ্ট্য

ফিলিস্তিন ইস্যুতে ইখওয়ান যখন কায়রোয় শোভাযাত্রা বের করে, তখন ইমাম নিজেই এ শোভাযাত্রার নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন। শোভাযাত্রা আল আতাবা আল-খাদরা নামক স্থানে পৌঁছলে পুলিশ বিক্ষোভকারীদের উপর আক্রমণ চালায়। তিনি এগিয়ে গিয়ে গুলী চালাতে পুলিশকে বারণ করেন। কিন্তু বিক্ষোভকারীদের উপর গুলী হচ্ছে দেখে তিনি এগিয়ে যান। দু'হাত উঁচু করে আমাদেরকে আড়াল করে রাখার চেষ্টা করেন। আমি দেখতে পাই, তাঁর উভয় হাত রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে। কিন্তু তিনি আমাদেরকে সান্ত্বনা দিয়ে বলছেন, এটা একটা মামুলী ব্যাপার। এতে অস্থির হলে চলবে না। অবশ্য আমাদের মনে হচ্ছিল হাসানুল বান্নার হাতে নয়, বরং আমাদের নিজেদের হাতে এ গুলী বিদ্ধ হচ্ছে। আল হালমিয়া ময়দানে তিনি প্রতি বুধবার দারস দিতেন। একবার এক যুবক একটা মজার প্রশ্ন করে। প্রশ্ন শুনে ইমাম বেশ হাসেন। পরে বেশ সুন্দরভাবে তার প্রশ্নের জবাব দেন। প্রশ্নটি ছিল: ভালোবাসা হারাম না হালাল? তিনি জবাব দেনঃ হালাল ভালোবাসা হালাল। আর হারাম ভালোবাসা হারাম। দারুল ইখওয়ানের সহযোগীদের সঙ্গে তাঁর বেশ হৃদ্যতা ছিল। সকলে খাওয়ার জন্য বাসায় গমন করলে তিনি দফতরের চাপরাশীদের সঙ্গে বসে একত্রে খাবার খেতেন (শহীদ ইমাম পৃষ্ঠা ৭১)।

◆ দাওয়াতের প্রতি আকর্ষণ

আব্দুর রহমান আল বান্না বলেন ঃ

দাওয়াতের দায়িত্ব হাসানুল বান্নার উপর জ্বরের মতো চেপে বসেছিল। আমরা তাঁর আসরে বসতাম। এ জ্বরের ক্রিয়া আমাদের পর্যন্ত পৌঁছতো। আমরাও দুনিয়া আর দুনিয়াদারী থেকে দূরে সরে যেতাম। তিনি লোকদেরকে এভাবে আহ্বান করতেন ঃ লোকসকল! আমাদের দিকে এসো। যারা রাসূলে খোদাকে পায়নি, তারা আমাদের সঙ্গে এসে মিলিত হোক। আমরা সে মহান সত্বার কাফেলার অন্তর্ভুক্ত। যারা মহানবী (দঃ)-এর খেদমতে হাজির হতে পারেনি, তারা যেন আমাদের প্রতি মুখ করে। আমরা দীর্ঘদিন থেকে মহানবী (দঃ)-এর দরবারের ভিক্ষুক হয়ে দাঁড়িয়ে আছি। যারা মহানবী (দঃ)-এর পাক

www.pathagar.com

জীবনী শুনেনি, তারা আমাদের কাছে শুনে নিক ঃ

إن النبي لحي في ضمائرنا على الزمان منها ويستمع

ففي قلوب يقوم الدين يحرسها وفي قلوب يقوم الحب والوله

- মহানবী (দঃ) আমাদের অন্তরে সদা জীবন্ত,

যুগ যুগ ধরে তিনি শুনে আসছেন।

যেসব অন্তর দ্বীনের রাখালী করে,

সেসব অন্তরে তাঁকে পাওয়া যায়।

যেসব অন্তর তাঁর ভালোবাসায় আপ্লুত,

সেসব অন্তরে তাঁকে পাওয়া যায়।

প্রচারের কাজে তিনি সফরে বহির্গত হলে সোজা মসজিদে গিয়ে অবস্থান করতেন। অধিকন্তু রমযান মাস তিনি সফরে কাটাতেন। মসজিদে অবস্থান করতেন এবং খেজুর আর পানি দ্বারা ইফতার করতেন। লোকেরা গৃহ থেকে পানাহার করে মসজিদে এসে তাঁকে দেখতে পেতো। নামাযের পর সাদাসিদা পোশাকে তিনি দাঁড়িয়ে আবেগপূর্ণ ওয়ায করতেন। পরে তারা জানতে পারতো যে, ইনি হচ্ছেন ইমাম হাসানুল বান্না (শহীদ ইমাম পৃষ্ঠা - ৭১)।

নানা ধর্মীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে সদাচার

হাসানুল বান্না ইসমাঈলিয়া গিয়ে দেখতে পান সেখানকার অধিবাসীরা ধর্মীয় বিরোধে লিপ্ত। সালাফী শিবির আর সূফী শিবির নামে দুটা ভিন্ন মতাবলম্বী দল সৃষ্টি হয়েছে। এদের মধ্যে সংঘাত চরমে পৌঁছেছে। এক দলের সমর্থকরা অন্য দলের পেছনে নামায পর্যন্ত পড়ে না। এহেন সংঘাতময় পরিবেশে তিনি সেখানে দাওয়াতের কাজ শুরু করেন। মসজিদের পরিবর্তে কফি হাউসকে তিনি তাঁর অভিযানের জন্য বাছাই করেন। এহেন বিরোধপূর্ণ পরিবেশে তিনি তাদের জন্য যে মুলনীতি ঠিক করেন, তা ছিল এই ঃ

১. যে কোন মূল্যে উম্মতের ঐক্য ও সংহতি বজায় রাখতে হবে।

২. মৌলিক বিষয়ে সকলকে ঐক্যমত পোষণ করতে হবে।

৩. অন্যদের সম্পর্কে ভালো ধারণা পোষণ করতে হবে এবং ভুল ও অন্যায় নিজের বলে মেনে নিতে হবে। এ ব্যাপারে ইমাম শাফেয়ী

www.pathagar.com

(রঃ)-এর এ উক্তিকে ভিত্তি হিসাবে গ্রহণ করতে হবে- আমি যার সঙ্গে বিতর্কে প্রবৃত্ত হয়েছি; তার সম্পর্কে আমার কামনা ছিল, আল্লাহ্ যেন আমার পরিবর্তে তার মুখ থেকে সত্য প্রকাশ করান।

৪. মতভেদ আর বিরোধে শিষ্টাচারের প্রতি লক্ষ্য রাখতে হবে।

৫. ধাপ্পাবাজী আর নিজেকে বড় মনে করা থেকে বিরত থাকতে হবে।

৬. লক্ষ্য রাখতে হবে যে, যথার্থ বিষয় একটা নয়, অনেক হতে পারে।

৭. সর্বসম্মত বিষয়ে একে অপরের সহায়তা করবে এবং বিরোধের ক্ষেত্রে একে অপরকে অপারগ মনে করবে।

৮. সমমনা দুশমনের সম্মুখে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে।

৯. কাজের ক্ষেত্র বিস্তৃত করতে হবে।

১০. বিভ্রান্তদের জন্য দুঃখ প্রকাশ করতে হবে। তাদেরকে মন্দ বলা যাবে না।

মু'মিন সূলভ দূরদৃষ্টি

আল্লাহ তা'আলা তাঁকে মুমিন সূলভ দূরদৃষ্টির বিরাট অংশ দান করেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার আগেই তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বলে দিয়েছিলেন যে, তিনি যে বাণী নিয়ে দাঁড়িয়েছেন, তা কোন্ কোন্ পথ হয়ে কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে। এটা ছিল এমন এক সময়, যখন ইখওয়ানের পরীক্ষা শুরুই হয়নি। তাঁর আন্দোলন তখন মাত্র প্রথম পর্যায় অতিক্রম করছিল। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বলে দিয়েছিলেন ঃ

প্রিয় সঙ্গীরা! আমি তোমাদেরকে বলতে চাই যে, এখনো অধিকাংশ মানুষ তোমাদের বাণী সম্পর্কে অজ্ঞ। যেদিন তারা আন্দোলন সম্পর্কে অবহিত হবে, এর তত্ত্ব সম্পর্কে জানতে পারবে, সেদিন তোমরা তাদের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধিতা; বরং কঠোর শত্রুতার সম্মুখীন হবে। সেদিন তোমরা নিজেদের সম্মুখে প্রত্যক্ষ করবে নানা রকম কষ্ট-ক্লেশ। তোমাদের পথে অসংখ্য বাধা-বিপত্তি সেদিন অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে। তোমরা সঠিক অর্থে তখনই সত্যের পতাকাবাহীদের উপ্যকায় প্রবেশ করবে। আজ তোমরা অখ্যাত অজ্ঞাত। কিন্তু তোমাদেরকে দাওয়াতের জন্য সর্বদা পথ সমতল করতে হবে। এ দাওয়াত যে জিহাদ আর কোরবানী দাবী করে, সে জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করতে হবে তোমাদেরকে। ইসলাম সম্পর্কে সাধারণ মানুষের অজ্ঞতা-ও তোমাদের পথের অন্তরায় হয়ে দাঁড়াবে।

www.pathagar.com

সরকারী আলেমরা তোমাদের ইসলামী ধ্যান-ধারণায় বিস্ময় প্রকাশ করবে। সত্য পথে তোমাদের জিহাদকে নাপছন্দ করা হবে। শাসক শ্রেণী, নেতা আর দণ্ডমুন্ডের অধিকারীরা তোমাদেরকে দেখে জ্বলে পুড়ে মরবে। সকল রাষ্ট্র ক্ষমতা, তোমাদের সম্মুখে প্রাচীর হয়ে দাঁড়াবে। সমস্ত সরকার তোমাদের কর্মতৎপরতা সীমাবদ্ধ করার চেষ্টা করবে। তারা তোমাদের পথে কাঁটা বিছাবে। তোমাদের বিরুদ্ধাচরণ আর তোমাদের দাওয়াতের আলো নির্বাপিত করার জন্য লুটেরার দল সব রকম অস্ত্র ব্যবহার করবে। এ উদ্দেশ্যে দুর্বল আর কাপরুষ সরকারকে ব্যবহার করবে। নিকৃষ্ট চরিত্র আর সদা ভিক্ষার জন্য প্রসারিত হস্ত তোমাদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করা হবে। একটা দল তোমাদের দাওয়াত সম্পর্কে সন্দেহ-সংশয়ের ধুলা ছিটাবে। মিথ্যা অপবাদ দেবে। তারা যে কোন দোষ তোমাদের ঘাড়ে চাপাবার চেষ্টা করবে। মানুষের সম্মুখে এ দাওয়াতকে নিকৃষ্ট আকারে উপস্থাপন করার চেষ্টা করবে। তাদের কাছে শক্তি থাকবে, ক্ষমতা থাকবে, অর্থ থাকবে, প্রভাব-প্রতিপত্তি থাকবে। এহেন পরিস্থিতিতে তোমরা নিঃসন্দেহে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। তোমাদেরকে কারাগারে নিক্ষেপ করা হবে, গৃহ থেকে বহিষ্কার আর দেশান্তরিত করা হবে। তোমাদের জমি-জমা বাজেয়াপ্ত করা হবে। তোমাদের গৃহ তল্লাশী করা হবে। পরীক্ষার এ পর্যায় দীর্ঘও হতে পারে।

- লোকেরা কি মনে করেছে যে, 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হবে? তাদেরকে কোন পরীক্ষা করা হবে না? কিন্তু তোমাদের সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা করেছেন যে, তিনি মুজাহিদদের সাহায্য করবেন এবং যারা ভালো কাজ করে, তাদেরকে শুভ পরিণাম দান করবেন (ইমাম বান্নার রচনা সংকলন পৃষ্ঠা ২২৯-২৩০)।

হাসানুল বান্নার গ্রন্থাবলী

ইমাম হাসানুল বান্না কোন লেখক-সাহিত্যিক ছিলেন না; সত্যিকার অর্থে তিনি ছিলেন একজন সংস্কারক এবং দায়ী ইলাল্লাহ- আল্লাহর দিকে আহ্বানকারী। তাঁর পূর্বসুরী আল্লামা রশীদ রেজা চিন্তা-গবষণার যে ধারা অবলম্বন করেছিলেন, তিনি তা অবলম্বন করেননি। তাঁর সম্মুখে ছিল ইসলামের জন্য কাজ করতে উদ্যত

www.pathagar.com

একদল জাঁ-বাজ মুসলিমের জন্য আন্দোলন গড়ে তোলা। যারা নিজেদের জীবনকে ইসলামের আমলী ছাঁচে ঢালাই করতে প্রস্তুত, যারা হবে দুনিয়ার সম্মুখে ইসলামের আদর্শ চরিত্রের নমুনা। এ কারণে তিনি জ্ঞান-গবেষণার চেয়ে কর্মের প্রতি বেশী গুরুত্ব দেন। আন্দোলনের পতাকাবাহী আর সমর্থকদের নৈতিক আর মানসিক লালনের জন্য তিনি জীবন উৎসর্গ করেন। একদা তাঁকে জিজ্ঞাসা করা হয়, আপনি কেন গ্রন্থ রচনা করেন না? জবাবে তিনি বলেন اصنف الرجال

আমি মানুষ রচনা করি। এরপরও বিভিন্ন সময় তিনি কিছু গ্রন্থ রচনা করেছেন। এখানে তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেয়া হচ্ছে ঃ

مذكرات الدعوة والداعية

(দাওয়াত ও দায়ীর ডায়রী)। এটাকে তাঁর রচনা না বলে কলিজার টুকরা বলাই বিধেয়। এ ডায়রী দু'ভাগে বিভক্ত। একভাগ নিজের আত্মজীবনী ও মানসিক অবস্থার বিবরণ। দ্বিতীয় অংশে আন্দোলনের তৎপরতা, কর্মসূচী এবং কার্যবিবরণী পেশ করা হয়েছে।

رسائل الامام الشهيد এটা কয়েকটা পুস্তিকার সংকলন। এতে অন্তর্ভুক্ত পুস্তিকাগুলোর বিবরণ নিম্নরূপ ঃ رسالة التعليم

এতে ইখওয়ানের সাথে যথারীতি সংশ্লিষ্ট ব্যক্তদেরকে হেদায়াত দেয়া হয়েছে। এতে তিনি সেসব কর্মীকে সম্বোধন করেছেন, যারা শপথ গ্রহণ করেছে। এতে তিনি স্পষ্ট করে বলেছেন যে, দশটা মূল নীতি হচ্ছে দলের শপথ গ্রহণের ভিত্তি। (১) প্রজ্ঞা বিচক্ষণতা ও দূরদৃষ্টি (২) ইখলাছ তথা নিষ্ঠা ও ঐকান্তিকতা (৩) আমল তথা কর্ম (৪) জিহাদ (৫) কোরবানী (৬) আনুগত্য (৭) দৃঢ়তা (৮) একাগ্রচিত্ততা (৯) ভ্রাতৃত্ব এবং (১০) পরস্পরের প্রতি আস্থা।

বায়য়াত গ্রহণ করার পর জীবনের সমস্ত দিক ও বিভাগে সদস্যদের উপর কি কি দায়িত্ব বর্তায় এবং ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে কি কি কাজ করতে তারা বাধ্য এবং কোন্ কোন্ বিষয় থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে হবে।

رسالة الجهاد এতে জিহাদের প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব, জিহাদের ফযীলত এবং জিহাদ যে ফরয, তা আলোচনা করা হয়েছে। ইখওয়ানের স্বেচ্ছাসেবীরা যখন ফিলিস্তিনে ইহুদীদের বিরুদ্ধে জিহাদে নিয়োজিত, তখন তিনি এ পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এটা কোন তত্ত্ব ও তথ্যপূর্ণ রচনা নয়, বরং জাঁবাজ বাহিনীর জন্য নির্দেশিকা।

www.pathagar.com

(নব পর্যায়ে আমাদের দাওয়াত)। ইখওয়ানের আন্দোলন যখন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল, তখন তিনি এ পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। এ সময় একদিকে যুবসমাজ দলে দলে ইখওয়ানে যোগদান করছিল এবং অন্যদিকে ইখওয়ানের বিরুদ্ধে নানা সন্দেহ সংশয় ছড়ানো হচ্ছিল বিরুদ্ধবাদীদের পক্ষ থেকে। যেসব বিষয়ে অঙ্গুলী নির্দেশ করা হয়, এতে তিনি সেসব দিক স্পষ্ট করেন। প্রথমে তিনি বলেন যে, আমাদের দাওয়াত কোন সংকীর্ণ-সীমাবদ্ধ দাওয়াত নয়। বরং এটা হচ্ছে এক বিশ্বজনীন দাওয়াত। এ দাওয়াত সকল মানুষের প্রতি। ঈমান আর প্রজ্ঞা উভয়ের সংমিশ্রণে এ দাওয়াত প্রতিষ্ঠিত। তদানিন্তন মিশরে চার ধরনের চিন্তাধারা ছড়ানো হচ্ছিল (১) মিশরীয় জাতীয়তাবাদ (২) আরব জাতীয়তাবাদ (৩) প্রাচ্যবাদ এবং (৪) সার্বজনীনবাদ। এসব মতবাদ আর চিন্তাধারা সম্পর্কে ইখওয়ানের দৃষ্টিভঙ্গিও এতে স্পষ্ট করা হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি ইখওয়ানের লক্ষ্য উদ্দেশ্য ব্যক্ত করে বলেন ঃ

আমরা মিশরে একটা ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করতে চাই। যে রাষ্ট্র ইসলামের বিধান মেনে চলবে, আরব জাতিগুলোকে ঐক্যবদ্ধ করবে এবং তাদের কল্যাণ সাধনের প্রয়াস চালাবে। উপরন্তু তা সারা বিশ্বের মুসলমানদেরকে যালেম শক্তির আগ্রাসন থেকে রক্ষা করবে, সারা বিশ্বে আল্লাহর বাণী বুলন্দ করবে এবং আল্লাহর দ্বীনের প্রচার-প্রসার ঘটাবে। حتي لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله যাতে ফেৎনা বিপর্যয় অবশিষ্ট না থাকে এবং সর্বতোভাবে আল্লাহর আনুগত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। সবশেষে তিনি ইখওয়ানের কর্মপন্থার প্রতি ইঙ্গিত করে বলেন, আমরা চাই মুসলিম ব্যক্তি, মুসলিম পরিবার এবং মুসলিম সমাজ প্রতিষ্ঠা করতে।

الرسا ئل الثلاث এটা তিনটি পুস্তিকার সমষ্টি। প্রথম পুস্তিকা হচ্ছে- আমাদের আহ্বান। দ্বিতীয়টি- কোন্ বস্তুর প্রতি আমরা মানুষকে আহ্বান জানাই, তৃতীয়ত- আলোর দিকে আহ্বান।

তৃতীয় পুস্তিকা মূলত একটি পত্র। ১৯৩৬ সালে মিশর ও সুদানের বাদশাহ ফারুক, প্রধানমন্ত্রী নাহাশ পাশা এবং সকল মুসলিম দেশের শাসকদের নিকট তিনি এ পত্র প্রেরণ করেন। এ পত্রে তিনি অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাষায় প্রথমে ইসলামের মূলনীতি এবং ইসলামী সভ্যতা-সংস্কৃতি বিবৃত করেন। এতে তিনি স্পষ্ট উল্লেখ করেন যে, এহেন মহান জীবন দর্শন বিদ্যমান থাকতে পাশ্চাত্যের

www.pathagar.com

জীবনধারা ও রীতিনীতির অনুকরণ করা নিতান্তই পরিতাপের বিষয়। এতে ইসলামী জীবন দর্শন আর পাশ্চাত্যের জীবন দর্শনের তুলনামূলক আলোচনাও করা হয়েছে। উভয় জীবনধারার বৈশিষ্ট্য আলোচনা করে বলা হয়েছে যে, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক- সকল বিবেচনায় ইসলাম হচ্ছে সর্বোত্তম জীবন দর্শন। ইসলাম সকল ক্ষেত্রে মানবতার রক্ষাকবচ। সবশেষে ৫০ ধারা সম্বলিত সংস্কারের সুপারিশমালাও পেশ করা হয়েছে। এসব সুপারিশমালার দশটার সম্পর্ক রাজনীতি, আইন বিচার এবং প্রশাসনের সঙ্গে, তিরিশটার সম্পর্ক শিক্ষা ও সমাজের সঙ্গে এবং দশটার সম্পর্ক অর্থনৈতিক সমস্যার সঙ্গে।

بين الامس واليوم (অতীত ও বর্তমানের তুলনা)। এটা হাসানুল বান্নার প্রথম রচনা। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার কিছুকাল পূর্বে তিনি এ পুস্তিকা রচনা করেন। এতে তিনি ইসলামের উৎস ও মূলনীতি বিবৃত করেন এবং জাতীয় সংস্কারের মৌলিক উপাদানের বিবরণ দেন। শুরুতে কোরআনের আলোকে এবং মহানবী (দঃ)-এর নেতৃত্বে প্রতিষ্ঠিত প্রথম ইসলামী রাষ্ট্রের পরিচয় তুলে ধরেন। প্রাসঙ্গিকভাবে মুসলমানদের পতনের কার্যকারণও পর্যালোচনা করেন। সবশেষে ইখওয়ানের দাওয়াত সম্পর্কে বলেন যে, ইখওয়ান হচ্ছে ইসলামের পুনর্জাগরণ আর মানবতার মুক্তির অপর নাম।

رسالة المؤتمر الخامس এটা ইখওয়ানের পঞ্চম বার্ষিক অধিবেশনে প্রদত্ত ইমাম হাসানুল বান্নার ভাষণ। এ অধিবেশনে ইখওয়ানের দশ বৎসরের সংগ্রাম সাধনার পর্যালোচনা করা হয় (১৯২৮-১৯৩৮)। এতে তিনটি বড়ো শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে (১) ইখওয়ানের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং তার আহ্বানের বৈশিষ্ট্য (২) দাওয়াত প্রসারের নিমিত্ত ইখওয়ান কোন্‌সব উপায় উপকরণ প্রয়োগ করে এবং ইখওয়ানের কর্মপন্থা কি (৩) দেশের নানাবিধ সংস্থা-সংগঠন এবং নানা মতাদর্শ সম্পর্কে ইখওয়ানের দৃষ্টিভঙ্গি। ইখওয়ানের আহ্বান বুঝার জন্য ইমামের এ ভাষণ নিতান্ত জরুরী।

الاخوان المسلمون تحت راية القرآن (ইখওয়ানুল মুসলিমুন কুরআনের পতাকাতলে)। এটাও হাসানুল বান্নার একটা ভাষণ। ১৯৩৯ সালের ৪ এপ্রিল কায়রোয় দারুল ইখওয়ানের সম্মুখে আয়োজিত এক বিশাল সমাবেশে ইমাম এ ভাষণ দেন। এতে দলের লক্ষ্য-উদ্দেশ্য এবং যুব সমাজের দায়িত্ব-কর্তব্য বিষয়ে আলোকপাত করা হয়। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণের ফলে যেসব বিকৃতি মিশরীয় সমাজকে ঘুনের

www.pathagar.com

মতো খেয়ে খুলখুলে করে ফেলছে, সে সবের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্যও এতে আহ্বান জানানো হয়।

مشكلا تنا في ضوء النظام الاسلامي

(ইসলামী বিধানের আলোকে আমাদের সমস্যা)। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তিনি এ পুস্তিকা রচনা করেন। এতে মিশর এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করা হয়। এতে জাতীয় সমস্যাবলীকে দু'ভাগে বিভক্ত করে সংস্কারের প্রস্তাব পেশ করা হয়।

প্রথমাংশে শাসন ব্যবস্থার ত্রুটি পর্যালোচনা করে ইসলামী আদর্শের আলোকে সংস্কারের দিকে নির্দেশ করা হয়। আর দ্বিতীয় অংশে ইসলামের অর্থনৈতিক বিধান সম্পর্কে আলোচনা করা হয়। ইসলামের অর্থনৈতিক বিধানের বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে অর্থনৈতিক বিকৃতির প্রতিবিধানের প্রস্তাব করা হয়।

خطب حسن البنا (হাসানুল বান্নার ভাষণ)। ইমাম হাসানুল বান্নার সংক্ষিপ্ত ভাষণ আর দারসের সংকলন।

مقالات حسن البنا ইখওয়ানের বিভিন্ন পত্রিকায় প্রকাশিত হাসানুল বান্নার প্রবন্ধের সংকলন।

الماثورات এটা মাসনুন দোয়ার সংকলন।

এছাড়া তাঁর আরো কিছু ভাষণ, নিবন্ধ এবং পত্রাবলী এখনো গ্রন্থাবদ্ধ হয়নি।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল-ফালাহ্ পাবলিকেশন্স-এর প্রকাশিত কিছু বইয়ের তালিকা

	বইয়ের নাম	লেখকের নাম	মূল্য
১।	মহিলা সাহাবী	নিয়াজ ফতেহ্পুরী	১২০/-
২।	কারাগারের রাত-দিন	জয়নব আল-গাজ্জাল	৯০/-
৩।	শহীদ হাসানুলবান্নার ডায়রী	খলিল আহ্মদ হামিদী	৭০/-
৪।	ইমাম হাসানুল বান্না ও সমকালীন মিসর	খলিল আহ্মদ হামিদী	৪০/-
৫।	রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যাঁরা (১ম খন্ড)	আব্দুল মালাম মিতুল	৬০/-
৬।	রক্ত পিচ্ছিল পথের যাত্রী যাঁরা (২য় খন্ড)	আব্দুস সালাম মিতুল	৫০/-
৭।	নতুন অতিথির মিষ্টি নাম	আব্দুস সালাম মিতুল	৩৫/-
৮।	কোরআন হাদীসের আলোকে আখেরাতের চিত্র	মাওঃ খলিলুর রহমান মুমিন	৫৫/-
৯।	সত্যের বিরোধীতার পরিণতি	মাওঃ খলিলুর রহমান মুমিন	৩০/
১০।	প্রশ্নোত্তরে ব্যবহারিক মাসায়েল শিক্ষা	মাওঃ খলিলুর রহমান মুমিন	১৫/-
১১।	ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের শ'রয়ী মর্যাদা	সিরাজুদ্দীন ইমামী	৫০/-
১২।	বক্তৃতার আট (বক্তৃতা শিক্ষার কলা-কৌশল)	সিরাজুদ্দীন ইমামী	৩০/-
১৩।	বিপ্লবের ঘোড়া	মোশারফ হোসেন খান	২৫/-
১৪।	বাংলাদেশ সামরিক সম্ভাবনার সুপ্ত আগ্নেয়গিরি	লেঃ (অবঃ) আবু রূপদ	৫০/-
১৫।	ইনসাইড'র (ভারতীয় গুপ্ত সংস্থার অজানা অধ্যায়)	অশোক রায়না	৭০/-
১৬।	নামায কি শিক্ষা	শেখ আনসার আলী	৭/-
১৭।	নব তরঙ্গ (নির্বাচিত ইসলামী গানের বই)	মোশারফ হোসেন সাগর	৪৫/-
১৮।	বিষয়ভিত্তিক কোরআন হাদীস সঞ্চায়ন (১ম ও ২য় খন্ড)	মাওলানা আতিকুর রহমান	৩২/-
১৯।	বঙ্গানুবাদ সহ বিষয়ভিত্তিক কোরআন হাদীস	মো: রফিকুল ইসলাম	১০/-
২০।	ইনফর্ম ব্যাংক ইন্টারভিউ গাইড	নজরুল ইসলাম খান আল-মারুফ	৬০/-নীট
২১।	ইসলাম বিদ্বেষীদের অপপ্রচারের জবাব	আবুবকর সিদ্দিকী	১৫/-
২২।	ওমর ইবনে আবদুল আজীজ (গল্প শোন-১)	নূর মুহাম্মদ মল্লিক	৩০/-
২৩।	বেহেস্তের সুসংবাদ পেলেন যারা (গল্প শোন-২)	নাসির হেলাল	৫০/-
২৪।	যে যুদ্ধের শেষ নেই (গল্প শোন-৩)	আব্দুস সালাম মিতুল	২৫/-
২৫।	শেখ সা'দী (গল্প শোন-৪)	নূর মোহাম্মদ মল্লিক	২০/-
২৬।	সত্যের আলো	মাওলানা বশিরুজ্জামান	৬০/-
২৭।	দারসুল কুরআন (একত্রে)	আবু জাকের মু: বদরোদ্দোজা	৬০/-
২৮।	দারসুল কুরআন (১ম ও ২য় খন্ড)	আবু জাকের মু: বদরোদ্দোজা	৩৫/-
২৯।	ফিক্হী পরিভাষা অভিধান	মাও: মু: খলিলুর রহমান মুমিন	১২০/-
৩০।	রক্তাক্ত ক্যাম্পাস (উপন্যাস)	রানা সন্দীপ	৫০/-
৩১।	আশা আছে ভাষা নেই	কামাল সিদ্দিকী	৫০/-

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

আল-ফালাহ্ পাবলিকেশন্স, ঢাকা।
(প্রফেসর'স বুক কর্ণার এর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
১৯১, ওয়্যারলেস রেলগেইট, বড়মগবাজার, ঢাকা।
ফোন ঃ ৯৩৪১৯১৫